রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনায় ভাববাদ ও রূপবাদ

গবেষক - আজিজুর রহমান

RB
M.P.L
782
RAR
c.1

রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনায় ভাববাদ ও রূপবাদ

GIFT

Dhaka University Library
403545

গবেষক-আজিজুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক- অধ্যাপক ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী

403545

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত থিসিস

আজিজুর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ৮৪/৯৭-৯৮
শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯৭-৯৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403545

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ফোন: পিএবিএক্স ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২৪০ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম-ফিল গবেষক আজিজুর রহমান আমার তত্ত্বাবধানে "রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চেতনায় বেদবাদ ও রূপবাদ" শিরোনামে দুই বছরের অধিককাল গবেষণা করেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। তাঁর নিরলস চেতনাদীপ্তির সঙ্গে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ পত্র (Thesis) প্রস্তুত করেছে।

আমার জানামতে, এই অভিসন্দর্ভ পত্রের (Thesis) কোন অংশ পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোনোখানে প্রকাশিত হয়নি।

২৭.১২.০৫

Dr. Mridul Kanti Chakrobarty
Professor
Department of Theatre & Music
University of Dhaka

403545

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি, সংগীতচিন্তা, কথা ও সুরের প্রকাশধর্মীতার উপর ভিত্তি করে সংগীতভাবনায় ভাব, আবেগ এবং রূপ প্রকাশের স্বরূপ নির্ধারণই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। এই গবেষণার প্রাথমিক প্রেরণা পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশ্বভারতী, সংগীত ভবনের অধ্যাপক সিতাংশু রায়ের কাছে। এই গবেষণাপত্রের শিরোনাম নির্ধারণ, অবয়ব গঠন, রূপরেখা, সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আমার শিক্ষক ও এই গবেষণা পত্রের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা প্রত্যেকটি পর্বে তাঁর গভীর অনুধ্যান ছিল আমার পরম পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের সংগীত, শিল্প, সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, গবেষণা কার্যে সঠিক দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কার্যকে সহজতর করেছে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তিনি আমায় ঋণী করেছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

গবেষণাকালে যাঁদের সাথে আলোচনায় আমি ঋদ্ধ হয়েছি, যাঁদের সুপরামর্শ আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছেন তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন রেজওয়ানা চৌধুরী, উক্ত বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর দীপক পাল, ছায়ানট সংগীতবিদ্যায়তন এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ড. সন্‌জীদা খাতুন। রবীন্দ্র গবেষক ও সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক। শ্রদ্ধাভাজন সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

উক্ত গবেষণাপত্র রচনায়, রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বিভিন্ন রবীন্দ্রগবেষকের গ্রন্থপাঠ, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার স্বরূপ নির্ধারণে আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। এসবের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরী, শিল্পকলা একাডেমী লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ- শিল্পকলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ লাইব্রেরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত গ্রন্থাগারের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। এদের সহযোগিতা

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমার স্ত্রী নূর মহল শারমীন, প্রভাষক, কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, উক্ত গবেষণাপত্র পাঠ, প্রুফ সংশোধন এবং সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে আমার গবেষণার কাজে গতি দান করেছেন। আমি তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বচ্ছ, যৌক্তিক, তথ্যনির্ভর করার উদ্দেশ্যে যেসব গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা নিয়েছি যথাস্থানে তা উল্লেখ করেছি। যদি কোথাও কোন অপূর্ণতা থেকে থাকে তা ইচ্ছাকৃত নয়।

তারিখঃ ২৫-১২-২০০৫ইং

আজিজুর রহমান

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
উপক্রমণিকা-	০১
রবীন্দ্রপূর্ববর্তী সময়ে কোলকাতার সংগীতচর্চ্চা-	০৯
রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের সংগীতচর্চ্চা এবং ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ-	২১
রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন গীতশৈলীর প্রভাব-	৩৩
রবীন্দ্রসংগীতের বিবর্তন, একটি সমীক্ষা-	৫৩
পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার ক্রমবিকাশ-	৭২
পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তায় ভাববাদ ও রূপবাদ-	৮০
প্রাচীন ভারতীয় সংগীতচিন্তা-	৯৪
রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনায় ভাববাদ ও রূপবাদ-	৯৯
গ্রন্থপঞ্জি-	১১৫

উপক্রমণিকা

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন তাঁর সংগীতের সবচেয়ে বড় ভাষ্যকার। নানা ভাষ্যে, বক্তৃতায়, আলাপ আলোচনায়, চিঠিপত্রে, বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে কবি তাঁর নিজের সংগীতের পর্যালোচনা করেছেন এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়, তথা সার্বিক সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গান এবং সংগীত সমন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম বয়সে সংগীতকে বিশেষ করে কথাযুক্ত সংগীতকে কবি ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপেই দেখেছেন। জনসমক্ষে কবির পঠিত প্রথম প্রবন্ধ 'সংগীত ও ভাব' (১৯ এপ্রিল, ১৮৮১, বেথুন সোসাইটি, কোলকাতায় পঠিত)। এই প্রবন্ধে কবি সংগীতের ব্যাকরণ ও কৌশলনির্ভর ওস্তাদদের তীব্র সমালোচনা করে কবি বলেছেন "সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান, আমাদের মনোভাব গাঢ়তম, তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায় স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি।" আমাদের সাধারণ কথপোকথনে সুরের উচ্চতা নীচতা, একটা সুরের আমেজ থাকে। আবেগের আধিক্যে এই উচ্চতা নীচতা অর্থাৎ সুরেরও আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কবির মতে সেই সুরের উচ্চতা নীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। "আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়। সংগীত আর কিছু না সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। ------- রাগ রাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র।" প্রবন্ধটি *'ভারতী'* জৈষ্ঠ ১২৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশকালে পত্রিকার সম্পাদক একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন- "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কী কী সুরবিন্যাস দ্বারা কী কী ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক গান এবং গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।" (ভারতী, জৈষ্ঠ ১২৮৮)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই সময়ে কবি বেশ কিছু ভাবাবেগ প্রকাশক গান রচনা করেছিলেন।

এই ভাবধারার দ্বিতীয় প্রবন্ধ *'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগীতা'* ভারতী পত্রিকার পরের সংখ্যাতেই (আষাঢ় ১২৮৮) প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রথমে কবি উল্লেখ করলেন।

" *'সংগীত ও ভাব'* নামক প্রবন্ধ রচনার পর হার্বার্ট স্পেন্সরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম *'The Origin and Function of Music'* নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে, এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।"

স্পেন্সর উল্লিখিত প্রবন্ধে সংগীতের আবেগ অনুভূতিগত কারণ এবং এর উপযোগীতা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সম্বন্ধে স্পেন্সরের একটি উক্তি উল্লেখ করছি-

"Every one of the alterations of voice which we have found to be physiological result of pain or pleasure, is carried to its greatest extreme in vocal music."[১]

স্পেন্সরের বক্তব্যের আলোকে কবি *'সংগীতের উৎপত্তি উপযোগীতা'* প্রবন্ধে বললেন- "সুখ-দুঃখ প্রভৃতি উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে পরিবর্তন হয় সংগীতে তারই চূড়ান্ত হয় মাত্র।----- চূড়ান্ত সুখ-দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।"

সংগীত সম্বন্ধে কবির তৃতীয় প্রবন্ধ *'সংগীত ও কবিতা'* ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তৎকালীন ওস্তাদদের ভাবহীন ব্যাকরণ সর্বস্ব গায়নভঙ্গীর সমালোচনা করে কবি বললেন-

"সংগীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, ভাবের রাগ রাগিণী।------ সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দেই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দেই।"

কবিতা ও সংগীত, শিল্পের এই দুই মাধ্যমকে 'জমজ ভ্রাতা' হিসেবে কল্পনা করে কবি বলেছেন যে দুটোরই উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। কবিতার আশ্রয় ভাববোধক, অর্থবোধক কথা ও সংগীতের আশ্রয় সুর। যেহেতু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়, সুরের এই আপাত ইন্দ্রিয়সুখ সংগীতকে ভাবের চর্চা থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে, স্বরবিস্তার, তানকর্তব ও অলংকরণের প্রাধান্য ঘটিয়ে। অন্যদিকে ভাবশূন্য অর্থহীন কথার কোন মিষ্টত্ব নেই বলে কবিতাকে করতে হয়েছে ভাবের চর্চা।

Mathew Arnold এর *Epilogue to Lessings Laocoon* কবিতার সারমর্ম উল্লেখ করে কবি বললেন যে, চিত্রকলার কাজ বিশেষ মুহূর্তের বাহ্য অবস্থাকে রূপায়িত করা, আর সংগীতের কাজ মানবমনের একটিমাত্র স্থায়ী ভাবকে প্রকাশ করা। কবিতা শুধুমাত্র একটি মুহূর্ত নয় সময়ের ধারাবাহিকতাকেও প্রকাশ করতে সক্ষম। Arnold এর এই সমীক্ষাকে অতিক্রম করে কবি বললেন যে গতিশীল ভাবও সংগীত প্রকাশ করতে পারবে। উল্লেখ্য সংগীতে গতিশীল ভাব প্রকাশের এই বিষয়টিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর গীতিনাট্যগুলিতে এবং শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যেও।

প্রথম জীবনের এই তিনটি প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে বোঝা গেল কবির সংগীতচিন্তার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল ভাব, আবেগ অর্থাৎ ভাবাবেগবাদের উপর।

এ সময়ের রচিত গানগুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শতাধিক গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল- হিন্দুমেলা ও সঞ্জিবনী সভাকে কেন্দ্র করে স্বাদেশিক ভাবোচ্ছাস, ভানু সিংহের পদাবলি, কৈশোরক আবেগতাড়িত সংলাপধর্মী কিছু প্রেম সংগীত, ঠাকুরবাড়ির পূর্বাচরিত ধারায় রচিত ব্রহ্মসংগীত এবং সুরে সংলাপধর্মী গীতিনাট্য *'বাল্মীকি প্রতিভা'*। প্রথম বয়সে রচিত কিছু গানের উদাহরণ দেয়া হল-

সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমরা আলোচনাটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে আলোচিত হবে রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠা গান। অর্থাৎ শৈশব থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের বিবর্তনের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা নন্দনতাত্ত্বিক। এ অংশে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংগীত চিন্তায় ভাববাদ ও রূপবাদের অবস্থান এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তায় ও সংগীত সৃষ্টিতে উক্ত বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রপূর্ববর্তী সময়ে কোলকাতার সংগীতচর্চ্চা

যে কোন বড় শিল্পের সৃষ্টিতে এর স্থান কাল, পরিবেশ, পরম্পরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ এর পেছনের প্রেক্ষাপট। রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তৎকালীন কোলকাতার সংগীতচর্চ্চা এবং পারিবারিক সাঙ্গীতিক উৎসধারার প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা এই সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা।

জন্মলগ্ন থেকেই কোলকতা শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর উৎসবমুখরতা। গোড়া থেকেই কোলকাতা শহরে বারোয়ারী পার্বণ, উৎসব লেগেই থাকত। এই সব উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, গীত-নৃত্যানুষ্ঠান। এই সব অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন কোলকাতার বাবু সমাজ (ধনী সমাজ)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোলকাতায় যে সব গীতধারা প্রচলিত ছিল সেগুলি হচ্ছে কীর্তন, কবিগান, বাংলা টপ্পাগান, আখড়াই গান, পাঁচালী ইত্যাদি। এছাড়াও এ সময়ে যাত্রা, থিয়েটার, অপেরা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেও একটা গীতধারা প্রচলিত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর, রাজ দরবারের সভাগায়কগণ স্থানীয় জমিদার এবং ধনীদের আশ্রয় করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কোলকাতার বিভিন্ন ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানেও চলতে থাকে উচ্চাঙ্গসংগীত চর্চ্চা।

বৈষ্ণবভাবাপন্ন শেঠ, বসাকদের আনুকূল্যে জন্মলগ্ন থেকেই কোলকাতায় কীর্তন গানের প্রচলন ছিল। কোলকাতায় মূলত দুই ধরনের কীর্তন প্রচলিত ছিল, নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে সংক্ষিপ্ত পদে পুনরাবৃত্ত সুরে ইস্টদেবতার নাম গাওয়া হত। লীলাকীর্তন হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত আখ্যানধর্মী গীত। আখ্যান এর অংশটুকু মূল গায়ক নিজেই অভিনয় করে দেখাতেন। মূল পদাবলী ছাড়াও লীলাকীর্তনে ছয়টি আলংকারিক উপাঙ্গ ব্যবহার করা হত। এগুলি হল– কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট এবং ঝুমুর।

দুটি পদের মধ্যে সংযোগ রাখবার জন্য অথবা কঠিন পদ শ্রোতাদের বোধগম্যতার জন্য কীর্তন গায়কগণ অনেক সময় স্বরচিত বাক্য ব্যবহার করে থাকেন, একে কথা বলে।

পরিবেশনায় মুন্সিয়ানা দেখানোর জন্য অনেক সময় গেয় পদের সাথে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গায়কগণ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন। একে দোঁহা বলা হয়।

খেয়ালগানে যেমন সুরবিহারের জন্য তান প্রয়োগের নিয়ম আছে, আখর তেমনি কীর্তন গানের বাক্য বিহার, রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন কথার তান। কীর্তন গায়কগণ ব্রজবুলিতে রচিত মূল পদ গাইবার সময় সুরে কথার বিস্তার করে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। একে আখর বলে। এই আখর পালাকারগণ গাইবার সময় তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে থাকেন।

তুক হচ্ছে একটি বিশেষ পদ গাইবার সময় এর ছন্দ ও অনুপ্রাসযোগে বিস্তার।

পালাটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বিভিন্ন অংশ তালফেরতা করে গাওয়া হচ্ছে ছুট।

পালাকীর্তনে সমাপ্তি সাধারণত মিলনান্তক হয়ে থাকে। যদি সময়ভাবে বা অন্য কোন কারণে সব কটি পালা গাওয়া সম্ভব না হয় তখন ঝুমুর নামে চটুল ও সংক্ষিপ্ত গীতের মাধ্যমে কাহিনী সংক্ষেপিত করে মিলন গেয়ে পালা শেষ করা হয়। পালাকীর্তন সাধারণত কয়েক ঘণ্টা ধরে গাওয়া হত। মূল গায়কের সাথে বেশ ক'জন সহযোগী থাকতেন যাঁরা গানের সময় ধুয়ো দিতেন।

গ্রাম্য সমাজ থেকে উঠে আসা গ্রাম্য সংগীত কোলকাতায় এসে শহুরে রুচির চাপে নতুন রূপ লাভ করে। কীর্তনের এমন একটি শহুরে ধরন হচ্ছে ঢপকীর্তন। পদাবলী কীর্তনের তুলনায় ঢপকীর্তনের পরিবেশন রীতি অনেক সহজ ছিল। ঢপকীর্তনেও কৃষ্ণ জীবনের নানা ঘটনা বিভিন্ন পালায় সাজানো হত। গানের মধ্যে নাটকীয় সংলাপ, বক্তৃতা, ছড়া বা দোঁহা এবং সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি করা হত।

কোলকাতায় আচরিত এই কীর্তন গানের সুর রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার প্রথম যুগেই তাঁর মনে স্থায়ী সাঙ্গীতিক প্রভাব ফেলেছিল। এর সাথে যোগ হয়েছে গীতগোবিন্দের পদাবলীর প্রভাব। প্রথম জীবনে রচিত ভানুসিংহের পদাবলী এবং কীর্তনাঙ্গ সুরে কিছু পূজার গান (১২৯১ বঙ্গাব্দে লেখা "আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে) কবির বাল্যজীবনে কীর্তন প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। পরবর্তী সময়ে শিলাইদহ বাসকালে পল্লী বাংলার কীর্তন গান এবং কীর্তনীয়াদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে এই প্রভাব আরো ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। "রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন গীতশৈলীর প্রভাব" অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা আরো ব্যাপক আলোচনা করব।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতার আর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতধারা হচ্ছে কবিগান। কবিগান উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক গান যাতে সুরের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। কবিগানের আসরে দু-দল কবিয়াল থাকতেন যারা প্রয়োজনানুসারে তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনা করতে পারতেন। কবিগানের বিষয়বস্তু হিসেবে দেবদেবীর প্রসঙ্গ, মানবীয় প্রেম, সামাজিক সমস্যা, পৌরণিক উপাখ্যান ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিগানের চারটি পর্যায় দেখা যায়।

(১) গুরুদেবের গীত (২) সখীসংবাদ (৩) বিরহ (৪) খেউড়।

গুরুদেবের গীত পর্যায়ে গুরুবন্দনা, সখীসংবাদে এ নায়ক নায়িকা গোপন অভিসার ও মিলনের বর্ণনা, বিরহ পর্যায়ে নায়িকার বিলাপ বিষয়ক রচনা এবং সর্বশেষ খেউর অংশে নায়ক নায়িকার মিলন বিষয়ক গান গাওয়া হত। একদল গানের মাধ্যমে প্রত্যেক পর্যায়ে চাপান (প্রশ্ন) দিত। অপরদল একই পর্যায়ে উতোর (উত্তর) দিত। এভাবে প্রশ্নোত্তর এর খেলার সাফল্যেই জয়পরাজয় নির্ধারিত হত।

ধনীগৃহের প্রাঙ্গণে প্রায় মধ্যরাত এর দিকে কবিগান শুরু হত। পায়ে নুপুর কোমরে লাল কাপড়, মাথায় পাখীর পালক পরা কবিয়ালগণ গানের সাথে সাথে নাচও করতেন। আসরের শুরুতে কবিয়ালগণ গৃহপ্রাঙ্গণে স্থাপিত দেবদেবীকে প্রণাম করতেন। তারপর শুরু হত

গানে গানে লড়াই। প্রত্যেক দলে একজন বাঁধনদার বা রচয়িতা থাকতেন। এদের কাজ ছিল ছড়া আকারে কঠিন প্রশ্ন (চাপান) তৈরী এবং অপর দলের প্রশ্নের উত্তর (উতোর) তৈরী। এই প্রশ্নোত্তরের খেলায় সুরে তালে সঠিক উত্তর হলে বাহবা দিত দর্শকেরা, আর না পারলে বিদ্রূপ করত। এভাবে জয় পরাজয় নির্ধারিত হত।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বিতীয় পুরুষ রামলোচন ঠাকুর ছিলেন কবিগানের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর উদ্যোগে কোলকাতার খ্যাতনামা কবিয়ালদের নিয়ে কবিগানের আসর বসত ঠাকুরবাড়িতে। কবিগানের মধ্যে হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গসংগীতের সাথে বাংলার কীর্তন ও লোক সংগীতের মিশ্রণ ঘটেছিল। অনেক কবিওয়ালা হিন্দুস্তানী রাগসংগীতে রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। কবিগানের বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে রামবসু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র পাল, বনমালী দাস, এন্টুনি ফিরিঙ্গ এদের নাম উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরগুপ্ত, প্রমুখ মহান ব্যক্তিরাও কবিগানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় রামবসুর গান গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানসের পরিপুষ্টিতে কবিগানেরও অল্পবিস্তর প্রভাব রয়েছে।

কীর্তনকে যেমন বাংলার নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল গান হিসেবে ধরা হয়, আখড়াই তেমনি কোলকাতায় নিজস্ব ক্লাসিক্যাল গান। আখড়াই মূলত উত্তরভারতের আখড়া গানের বহু বিবর্তিত রূপ। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে কোলকাতার আখড়াই গানের প্রথম যুগে শ্লীল-অশ্লীল ভেদে আখড়াই গান দ্বিধাবিভক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে কলুই চন্দ্র সেন এবং রামনিধি গুপ্ত'র প্রচেষ্টায় সাজবাদ্যোর (অর্কেষ্টা) সংযোগ এবং রাগ রাগিণীর বিশুদ্ধ ব্যবহারে আখড়াই গান ক্ল্যাসিক্যাল গানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। অন্যান্য শাস্ত্রীয় গানের মতই আখড়াই গানেও স্তবক বিন্যাস ছিল। এগুলো হচ্ছে মহড়া, চিতেন, প্রথম পাড়ঙ্গ এবং দ্বিতীয় পাড়ঙ্গ। এগুলো যথাক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীতের স্থায়ী, মেলাপক, প্রথম অন্তরা এরং দ্বিতীয় অন্তরার অনুরূপ। স্তবক বিন্যাসের মত সাজবাদ্যেও চারটি স্তর ছিল। এগুলি হচ্ছে পিড়েবন্দি, দৌলনদৌড়, সবদৌড় এবং মোড়। গায়কেরা প্রত্যেকটি স্তবক গাইবার মাঝখানে বিশ্রান্তিকালে সাজবাদকেরা যথাক্রমে পিড়েবন্দ, দৌলনদৌড়, সবদৌড় এবং মোড় এই চারটি স্তর বাজাত। যেমন মহড়া

গাওয়ার পর পিড়েবন্দি, চিতেন গাওয়ার পর দৌলনদৌড়, প্রথম পাড়ঙ্গ গাওয়ার পর সবদৌড়, দ্বিতীয় পাড়ঙ্গ গাওয়ার পর মোড়। মোড় বাজাবার এই স্তরে, অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে সাজবাদ্যের গতি দ্রুত হত। অনেকটা সেতারের ঝালার মত। আখড়াই গানে সাধারণত ঢোল, করতাল, মন্দিরা, বেহালা, তানপুরা, জলতরঙ্গ, বীণা, সেতার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহৃত হত। সুরের প্রকৃতি ছিল অনেকটা তালবর্জিত, সামান্য টপ্পার দানাযুক্ত খেয়ালাঙ্গ গানের মত। আখড়াই গানে কবি গানের মত চাপান উতোরের বাদানুবাদ ছিল না। বিভিন্ন দলের গীতসৌকর্যের উপরই জয় পরাজয় নির্ধারিত হত। নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গানের Form কে ভেঙ্গে হাফ আখড়াই নামে আরেক ধরনের গীতশৈলী উদ্ভাবন করেন। কবিগানের মত হাফ আখড়াই গানে চাপান-উতোর যুক্ত হল, রাগ এর ব্যবহার ও আরো সরলীকৃত হল।

পাঁচালী মূলত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রাম্যগীত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোলকাতায় আখড়াই, কবিগান ও টপ্পার ও সংস্পর্শে এসে এই প্রাচীন গীতধারার পুনঃসংস্কার ঘটে। পাঁচালীর পাঁচটি উপাঙ্গ ছিল। সাজবাদ্য, শ্যামা বা ভবানী বিষয়ক, সখী সংবাদ, বিরহ ও ছড়া কাটা। গায়কগণ প্রত্যেক পদের কিছুটা অংশ সুর করে গাইতেন, তারপরেই একাধিক দোঁহার এই অংশটি সমবেতভাবে পুনরাবৃত্তি করতেন। তারপর কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রে সুরটি বাজানো হত। আবার মূল গায়ক ওই পদটির কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন অভিনয়ের ভঙ্গীতে। এই ভাবে একবার গান, একবার অভিনয় পালা করে চলত। প্রথমদিকে কবি গানের অনুকরণে মূল গায়কের হাতে চামর, মন্দির এবং পায়ে নুপুর থাকত। পরবর্তীতে কোলকাতার নাগরিক পরিবেশে এই গ্রাম্য রূপ পরিত্যক্ত হয়। কোলকাতার বহু ধনী ব্যক্তি পাঁচালী গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ পাঁচালী গানের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে ছিলেন পাঁচালী দলের প্রাক্তন গায়ক। তিনি রবীন্দ্রনাথকে এ গান শেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বলেছেন– "আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব"। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত–পাঁচালি দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা

মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন,' 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমলআঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে'- এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

সমসাময়িক কালে যাত্রা-থিয়েটারকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় সংগীতের আরেকটি ধারা প্রবহমান ছিল। গ্রামাঞ্চলের অদৃষ্টবাদী পার্থিব জীবনের অসারতা বিষয়ক যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা এসে নাগরিক জীবনের আমোদ প্রমোদের উপকরণ হয়ে উঠেছিল। কাহিনী ও আঙ্গিক বিন্যাসে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগলেও ভক্তিবাদ, নীতিবাদ বিষয়ে যাত্রাওয়ালারা নতুনত্ব আনার সাহস করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নতুন কৃষ্ণযাত্রার উৎপত্তি হল তাতে মূলত তিনজন যাত্রাওয়ালার ভূমিকা ছিল। এঁরা হলেন গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

কীর্তন গায়ক গোবিন্দ অধিকারী কীর্তনের দল ছেড়ে যাত্রার দল করেন। তিনি কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন আঙ্গিকে সাজালেন। আগে কৃষ্ণযাত্রায় গানের অংশ বেশী ছিল, যাত্রার অধিকারী নিজে দূতীর ভূমিকা ছেড়ে কথকতা নীতিতে ঘটনার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতেন। কাহিনীর পারম্পর্য এবং দুটি গানের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য কিছু পদ্য সংলাপও তাঁকে করতে হত। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানের অধিকারীর ভূমিকা লুপ্ত করলেন এবং যাত্রাপালাকে নাট্যের আঙ্গিকে সাজালেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাগানের অপর দিকপাল ছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। মূলত কৃষ্ণকমল ছিলেন কথক ও কীর্তন গায়ক। এই সুবাদে কৃষ্ণকমলের যাত্রাগানে কীর্তন ও কথকতার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। কৃষ্ণকমলের যাত্রাগানে কথ্য সংলাপের চেয়ে গীতসংলাপের প্রাধান্য ছিল। তাই বলে যাত্রা কাহিনী ক্ষুণ্ন হবে এতটা সংগীত প্রাধান্যও কৃষ্ণ কমলের যাত্রাগানে ছিল না। কৃষ্ণকমল প্রাচীন নাট্যরীতিকেই মার্জিত করে ঊনবিংশ শতাব্দীর

নতুন যাত্রাগান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বহু গান কোলকাতাবাসী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

এই সময়ের যাত্রাগানে আরেক প্রবাদপুরুষ ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। নীলকণ্ঠ ছিলেন গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য। নিজে নতুন দল করার পরে নীলকণ্ঠ প্রথম প্রথম গুরুর পালা কিছুটা সংস্কার করে পরিবেশন করতেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য নিজেই পালা রচনা করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতার সুধী সমাজে নীলকণ্ঠ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কোলকাতার বিভিন্ন আভিজাত স্থান, বিশেষ করে পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাসভবনে তিনি প্রায়ই যাত্রা পরিবেশন করতেন।

এই সময়ে প্রচলিত আরেক ধরনের যাত্রা হচ্ছে সখের যাত্রা। এই সখের যাত্রা নতুন যাত্রা নামেও প্রচলিত ছিল। সখের যাত্রার সংগঠক ছিলেন সেই সময়ের অভিজাত শ্রেণী, ধনী সম্প্রদায়। এতে গদ্যসংলাপের ফাঁকে ফাঁকে গান, গীতসংলাপ থাকত। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' এর ভাষ্য অনুযায়ী নতুন যাত্রার বৈশিষ্ট্য এই রকম।

"নতুন যাত্রায় নানা প্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথপোকথন এ অতি চমৎকার সৃষ্টি।"

অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছেলেরাও সখের যাত্রায় উৎসাহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে "ছেলেবেলা" থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। "আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি।"

এই সখের যাত্রাই আরো উৎকর্ষিত হয়ে অপেরা বা গীতাভিনয় নাট্যরূপ সৃষ্টি হয়।

কোলকাতায় তখন পাশাপাশি চলছিল থিয়েটার চর্চ্চা। ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেদেফ নামে একজন রুশদেশীয় ব্যবসায়ী ইংরেজী নাটক বাংলা অনুবাদ করিয়ে বিদ্যাসুন্দরের গানে পাশ্চাত্য সুরারোপ করে কোলকাতায় প্রথম বাংলা থিয়েটার মঞ্চস্থ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত চৌরঙ্গী থিয়েটার বেঙ্গল থিয়েটার ইত্যাদি অনেক রঙ্গমঞ্চ কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। থিয়েটারের প্রধান উপজীবী ছিল গান। সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই গান থাকত। আজকাল দিনে যেমন সিনেমার গান লোকের মুখে মুখে ফেরে, তেমনি তখন থিয়েটারের গান লোকের মুখে মুখে ফিরত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝমাঝি, কবিগান তখন জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে। থিয়েটার যদিও তখন নিয়মিত মঞ্চস্থ হচ্ছিল, কিন্তু অভিজাত পরিবারের নিমন্ত্রিতদের মধ্যেই সেগুলো সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ই নতুন যাত্রা, সখের যাত্রার আয়োজনকে কেন্দ্র করে নতুন নাট্যবিষয় গীতাভিনয় বা গীতিনাট্যের উৎপত্তি। থিয়েটারের প্রয়োগকলা এবং যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল এই গীতিনাট্যের উপজীব্য। গীতিনাট্যকে ভিত্তি করে কোলকাতায় নতুন ধরনের নাট্যসংগীতের সূত্রপাত হয়। এই সময়ের গীতিনাট্যকে দুভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত যেগুলো আদ্যন্ত গানে বাঁধা, দ্বিতীয়ত যে সব গীতিনাট্য গানের প্রাচুর্য আছে কিন্তু সংলাপ পদ্যে বা গদ্যে বলা বাহুল্য দুটি রীতিকেই গীতিনাট্য বলা হলেও প্রথম ধারাটিকেই যথার্থ গীতিনাট্য আখ্যা দেয়া চলে। সমসাময়িক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' এ প্রকাশিত একটি খবরের উদ্ধৃতি দেওয়া হল- "পেশাদার যাত্রার যেমন দু'একটি কথা তারপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল। অধ্যক্ষগণ এক্ষণে ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর, স্বগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন।" গীতিনাট্যে কাহিনী হিসেবে রামায়ণ, মহাভারত এর পৌরণিক কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছিল। ভাষার দিক থেকে কোলকাতার কথ্য ভাষাই ছিল এর উপজীব্য। গানের ভাষায় কবিগান, দাশু রায়ের পাঁচালী, ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ছিল বেশ, যদিও তৎসম শব্দঘেঁষা মৌলিক কাব্যময় গানও নেহায়েৎ কম ছিল না। গীতিনাট্যের কাহিনীতে একটা ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থাকলেও এর পরিবেশন শৈলী যথেষ্ট রুচিকর ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যচর্চ্চায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন পাথুরিয়াঘটো নাট্যশালার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাকোঁ নাট্যশালায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই দুই ঠাকুর পরিবারের অবদান অতিস্মরণীয়। সমসাময়িক কালে বিধৃত গীতিনাট্যের ধারাবাহিকতায়ই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য *"বাল্মীকি প্রতিভা"*। গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু ছিল নিতান্তই হাল্কা এবং নিম্নরুচির। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, প্রায় প্রতিটি গীতিনাট্যেই উচ্চাঙ্গের রাগ তাল ব্যবহৃত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিনাট্যে নিম্নোক্ত রাগতাল ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন ইমন, কল্যাণ, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পিলু, বারোঁয়া, বাহার, লুম, বিভাস, টোড়ি, মারবা, যোগিয়া, সিন্ধুভৈরব, শংকরা, কুকুভ, ললিত, আলাইয়া, সাহানা, জয়-জয়ন্তী, মল্লার, হাম্বীর, পরজ, মূলতানী প্রভৃতি। ব্যবহৃত তালের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে ত্রিতাল, চৌতাল, কাওয়ালী, আড়াঠেকা, যৎ, মধ্যমান, ঝাঁপ, একতাল, তেওরা ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতার সংগীতচর্চ্চার আর একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল সম্পন্ন অভিজাত পরিবারগুলি। কোলকাতার অভিজাত পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চ্চা হত উচ্চাঙ্গসংগীতের। যে সকল অভিজাত পরিবার সংগীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তাদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি অন্যতম। এই পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ গোপীমোহন ঠাকুরের (১৭৬০-১৮৮৮) সময়কাল থেকেই সংগীতচর্চ্চার সূত্রপাত। গোপীমোহন এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরকুমার ঠাকুরও (১৭৯৬-১৮৫৬) উচ্চাঙ্গসংগীতের একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন। হরকুমার এর জ্যৈষ্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০১) এর সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারে স্থায়ী সংগীতচর্চ্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও এই পরিবারের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের যে সমস্ত প্রখ্যাত গায়ক বাদক নানা সময়ে গান করে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ধ্রুপদী জোয়ালাপ্রসাদ ও কামতাপ্রসাদ (কাশী), ধ্রুপদী মুরাদ আলী, শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র (বেতিয়া), আলী বকস, সেনী ঘরানার রবাব বাদক বাদৎ খাঁ, খেয়াল গায়ক আহম্মদ খাঁ (লক্ষ্ণৌ), লক্ষীপ্রসাদ মিশ্র, সাজ্জাদ মোহাম্মদ, আসাদ উল্লাহ খাঁ, কৌকব খাঁ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নুলো গোপাল), ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদু ভট্ট, কেশব

চন্দ্র মিশ্র, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ঠাকুর পরিবারের অপর গোষ্ঠী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ রামলোচন ঠাকুরের সময় থেকেই এই পরিবারে সংগীতচর্চ্চার সূত্রপাত হয়, এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। কোলকাতার সংগীতচর্চ্চার ইতিহাসে আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) পরিবার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ধনকুবের রামদুলাল দেব সরকারের (১৭৫২-১৮২৫) পুত্র আশুতোষ দেব (১৮০৫-৫৬) উচুঁ মাপের একজন সংগীতগুণী ছিলেন। তিনি নিজে একজন উত্তম সেতারবাদক, গায়ক, বাংলা টপ্পা, ভক্তিমূলক গান রচিয়তা এবং সংগীতকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সংগীতদরবার যারা অলংকৃত করেছেন তাঁরা হলেন সেজা খাঁ, রামকেশব ভট্টাচার্য, ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কোলকাতায় সেতারবাদনের প্রসার এবং বাংলা গানের ব্যাপক চর্চ্চার ব্যাপারে সাতুবাবুর অবস্থান অবিস্মরণীয়।

এরপর যে নামটি আসে তা হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ এর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ'র দরবার। কোলকাতায় ওয়াজিদ আলী শাহ দরবারের সংগীতচর্চ্চা পরম্পরাপগত নয়। ১৮৫৮ সালে লখ্নৌ এর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ ইংরেজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তারপর নবাব তাঁর নির্বাসিত জীবন যাপন করেন কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে। কোলকাতায় তাঁর আগমনে বহু বড় বড় সংগীতগুণীরও আগমন ঘটে। এইসব গুণীদের সংগীত পরিবেশন এবং প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিষ্য গঠনের ফলে এই দরবারকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় সংগীত চর্চ্চার এক নতুন স্রোত বয়ে গিয়েছিল, যা এই সময়ের সংগীতজাগরণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ'র দরবারে যে সব কলাবতরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘকাল এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থেকে যান। কোলকাতায় হিন্দুস্তানী ঠুংরীর পথিকৃৎ বলা হয় ওয়াজিদ আলী শাহকে। লখনৌ চালের হিন্দুস্তানী ঠুংরী তিনিই নিয়ে এসেছিলেন কোলকাতায় এবং তাঁর দরবারে এর নিয়মিত চর্চ্চা হত। মেটিয়াবুরুজের দরবারে নিযুক্ত উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞগণ হলেন গোলাম হোসেন খাঁ, পীর খাঁ, আলী বক্স খাঁ, আহম্মদ খাঁ, এনায়েত হোসেন খাঁ (পাখোয়াজবাদক), গোলাম মোহাম্মদ, কালুন নওয়াজ (সুরবাহার বাদক)। এ ছাড়াও আরো অনেক সংগীতগুণী এই দরবারে সংগীত পরিবেশন করে সভাকে অলংকৃত করে গেছেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রবর্তিত বাংলা গানের একটি ধারা হচ্ছে ব্রহ্মসংগীত। ব্রহ্মবিষয়ক সংগীত বা ব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ক সংগীত, এই অর্থে ব্রহ্মসংগীত কথাটি ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভক্তিগীতির ইতিহাস প্রাচীন। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ভিতর দিয়ে এর বিকাশ হয়েছে। তাতে ভক্তিগীতির সাধারণ সম্প্রদায় নির্ভর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতের ভিতর অপৌত্তলিক উপাসনা সংগীতের প্রসার ঘটে। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের নির্যাস ও হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতাকে বাদ দিয়ে রাজা রামমোহন রায় একটি আদর্শ মানবধর্মের কল্পনা করেছিলেন। এর নাম দিয়েছিলেন Universal Religion। এই Universal Religion এরই উৎকর্ষিত রূপ হচ্ছে ব্রাহ্ম ধর্ম। সামাজিক ঈশ্বরোপাসনার সংকল্প নিয়ে ১৮২৮ সালে ২৩ আগষ্ট ব্রাহ্ম সভার পত্তন হয়। ব্রাহ্ম ধর্মের মতো ব্রহ্মসংগীতেরও প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন, কালী মীর্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন তাঁর সংগীত গুরু। রামমোহন মোটামুটি চল্লিশ বছর বয়সে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। বোঝাই যায়, গায়ক হবার জন্য নয়, বরং রাগসংগীতের গভীর বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গানের মাধ্যমে প্রার্থনা এবং তদ্বারা চিত্তশুদ্ধির ব্যাপারে গভীর আস্থা ছিল রামমোহনের। প্রথাবদ্ধ ও পরিশীলিত সংগীতের প্রতি রামমোহনের আকর্ষণ ছিল বলে রাগ সংগীতের সুরেই তিনি উপাসনা সংগীত (ব্রহ্মসংগীত) রচনা করেন। টপ্পাবিদ কালী মীর্জার শিষ্য হিসেবে ধারণা করা যায় রামমোহন টপ্পাশৈলীতেই বেশী গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের স্তবক বিন্যাসও এই ধারণাকে জোরদার করে। কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তী ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক নিযুক্ত হন (১৮৩০ খ্রীঃ)। কয়েক বছর পর কৃষ্ণপ্রসাদ মারা গেলে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ছিলেন। প্রথম দিকে বিভিন্ন রচয়িতার রচিত ব্রহ্মসংগীতে বিষ্ণু চক্রবর্তীই সুরারোপ করতেন। ধ্রুপদী গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর প্রভাবে ব্রহ্মসংগীতরীতি ধ্রুপদীয় সংগীতধারায় যুক্ত হয়। পরে ধ্রুপদী যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট) আদি ব্রাহ্মসমাজে গায়ক হিসেবে যোগদান করলে ব্রহ্মসংগীতের ধ্রুপদীয় রাগসাঙ্গীতিক আদর্শ আরো মজবুত হয়। প্রচলিত হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল ভেঙ্গে ব্রহ্মসংগীত রচনার ধারাও পল্লবিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত সম্বন্ধে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

বলেছেন "আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত সকল প্রকার হিন্দি সুরের একটি রত্নাকর বিশেষ, তা মন্থন করলে হেন হিন্দি রাগতাল নেই যা পাওয়া যায় না।"

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছরের মধ্যে এতে বিভাজন দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মত পার্থক্য হলে কেশবচন্দ্র সেন ভারতীয় (নববিধান) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন ১৮৬৬ সালে। পরবর্তীকালে কেশব চন্দ্র সেনের সাথে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসু প্রমুখের মতভেদ ঘটায় ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে আরেকটি সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। মতাদর্শগত কারণে বিভাজন দেখা দিলেও ব্রাহ্ম নেতারা রামমোহন রায় প্রবর্তিত সংগীতাদর্শ হতে কখনেই বিচ্যুত হয়নি। তাঁর নিজ সমাজে ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদ ধারা অব্যাহত থাকলেও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনাঙ্গ সংগীতধারার প্রচলন দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে ক্রমে বাংলার লোকসুর ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সুর, এমনকি বিদেশী সুরও ব্রহ্মসংগীতধারায় মিলিত হয়। এভাবে ব্রহ্মসংগীত বহু সংগীত প্রবাহের এক রমণীয় মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর প্রভাব ঠাকুরবাড়ি কোলকাতা তথা বাংলা গানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুশীলিত সংগীতধারা অর্থাৎ ধ্রুপদাঙ্গিক উপাসনাসংগীত বিশেষ ভাবে রচিত হয় ঠাকুরবাড়িতে। ব্রহ্মসংগীতের এই ধারাই রবীন্দ্রনাথের পূজার গানের পূর্বসূত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের সংগীতচর্চ্চা বিষয়ে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের সংগীতচর্চ্চা এবং ছেলেবেলায় ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ

ছেলেবেলায় ঠাকুর বাড়িতে যে সংগীতোদ্যোগ দেখা যায় তার বীজ প্রোথিত হয়েছিল কয়েক পুরুষ আগেই। ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ জয়রাম ঠাকুরের দুই পুত্র নীলমণি ঠাকুর ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর ১৭৬৪ সালে কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস শুরু করেন। ১৭৮৪ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকো চলে আসেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন হয়। ঠাকুর পরিবারের এই উভয় শাখাতেই সংগীতের অনুশীলন সমান ধারায় অগ্রসর হয়েছিলো। বংশানুক্রমে পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন বাংলার সংগীত ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংগীত ঐতিহ্য অক্ষয় কীর্তি লাভ করেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথে এসে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রথম পুরুষ নীলমণি ঠাকুরের সংগীতপ্রীতির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলমণির পুত্র রামলোচন সংগীতামোদী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গায়ক বাদকদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমারোহের সঙ্গে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে রামলোচনের সংগীতপ্রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়- "রামলোচনের সময় বাঈনাচ ও কালোয়াতী গান ভিন্ন অন্য কোন মজলিসী আমোদ ছিল না। মহারাজা নবকৃষ্ণের কবি ও হাফআখড়াই বেশ জমিয়াছিল বটে কিন্তু খুব বেশী বিস্তৃত হয় নাই। রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি তখন বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের আদর তখনো সর্বজনীন হয় নাই। রামলোচন ঠাকুরই এই সব কবি ও কালোয়াতগণকে আহবান করিয়া নিজ বাড়িতে মজলিসী আমোদের বৈঠক করিতেন এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া শুনাইতেন। এই রূপে রামলোচন হইতেই উহার আদর সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রামলোচন ঠাকুর শুধু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংগীত ঐতিহ্যের সূত্রপাতকারী রূপেই নয়, কোলকাতার বৃহত্তর সম্পন্ন সমাজে কালোয়াতী সংগীত প্রচলনের পথিকৃৎ রূপেও স্মরণীয়[১]"।

অপুত্রক রামলোচন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে তাঁর চার বৎসর বয়সে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ রামলোচনের মতো শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সংগীতপদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বারকানাথ যখন বিলেত ছিলেন তখন অন্যান্য সহচরের সাথে একজন জর্মন সংগীতজ্ঞও ছিলেন তাঁর সঙ্গী হিসেবে। বিখ্যাত জর্মন পন্ডীত ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার এর উক্তিতে দ্বারকানাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতরীতিতে অভিজ্ঞতা এবং তাঁর গায়নক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়। ম্যাসক্সমুলার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানিয়েছেন- "তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সংগীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সাথে পিয়ানো বাজাতাম। এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন[২]..." দ্বারকানাথ সংগীত ও সংস্কৃতিকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকরূপে অত্যন্ত উদার ভূমিকা পালন করেন। পিতার মতো তিনিও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগীতোদ্যোগ আরো পল্লবায়িত হয় তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের আমলে। ব্রাহ্মধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তারূপে বিখ্যাত হলেও সংগীতসংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষকরূপেও খ্যাতি লাভ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে রাগসংগীত চর্চ্চা করেছিলেন। সে চর্চ্চা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে, তাঁর রাগসংগীতের মূল ভাবকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্যসংগীতেও তাঁর শিক্ষা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঘরোয়া গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্ক বলেছেন, "কর্তাদাদামশায়ের কালোয়াতী গান শেখার শখ ছিল। তিনি নিজেও আমাদের বলেছিলেন– 'আমি পিয়ানো শিখেছিলাম সাহেব মাস্টারের কাছ থেকে তা জানো[৩]।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী হিসেবে খুব পরিচিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংগীতের একান্ত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তৎকালীন কোলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ সংগীতকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের উপর রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত ভাবনাই শুধু নয় তাঁর সংগীতভাবনাও দেবেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করেছিলো। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বের সাথে সাথে রামমোহনের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যও গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে দীর্ঘকাল ধরে রাগসংগীতানুসারী উপসনাসংগীতের ব্যবস্থা করেন। ফলে এই উপাসনাসংগীতকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রাগসংগীতচর্চ্চার বিস্তার ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজে সংগীতবিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া তিনি শ্রেষ্ঠ গায়কদের আদি ব্রাহ্মসমাজে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাঁদের নিয়ে নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বিষ্ণু চক্রবর্তী একটানা পঞ্চাশ বছর সংগীতাচার্যের পদে নিযুক্ত থাকেন। ধ্রুপদসংগীতের ধারাকে তিনি কার্যকর ভাবে ব্রহ্মসংগীতের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন। দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে ধ্রুপদসংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ক্রমে ঠাকুর পরিবারের সংগীতচর্চ্চা ব্রাহ্মসমাজের ধ্রুপদীয় ধারার সাথে যুক্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজে আমন্ত্রিত গায়কেরা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংগীত শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হন। ব্রাহ্মসমাজে আমন্ত্রিত নন এমন গুণীরাও ঠাকুরবাড়িতে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, মৌলা বক্স প্রমুখ বরেণ্য সংগীতগুণীরা ঠাকুর পরিবারের সংগীত শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ এই সব বিখ্যাত কলাবতদের অধীনে সংগীত জীবন শুরু করেন। ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউ পাশ্চাত্য সংগীতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। বাড়ির মেয়েদের সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন। সেকালে ওস্তাদ রেখে মেয়েদের সংগীত শিক্ষাদান ছিল অভাবিত ব্যাপার। দেবেন্দ্রনাথ নিজে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন এবং সন্তানদের ব্রহ্মসংগীত রচনায় উৎসাহিত করতেন।

রামলোচন ছিলেন সংগীতের একজন পৃষ্ঠপোষক, দ্বারকনাথ গায়ক ও পৃষ্ঠপোষক, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে গায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও গীতরচয়িতা। বাংলায় ও সংস্কৃতে তিনি বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গানে গুরুগম্ভীর রাগ-তাল ব্যবহার করতেন। কানাড়া, ছায়ানট, হাম্বীর, বেহাগ, মালকোষ, কেদারা, বাগেশ্রী, পরজ, বাহার প্রভৃতি রাগে এবং চৌতাল, তেওট, একতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে গানে রচনা করেছেন দেবেন্দ্রনাথ।

এতে বোঝা যায় রাগসংগীতকে সৃজনশীলতার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহারের সংগীতক্ষমতা তাঁর ছিল। নিজ গৃহকে হিন্দুমেলার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে দিয়ে তিনি দেশাত্মবোধ ও দেশাত্মবোধক সংগীতের বিকাশে অমূল্য অবদান রাখেন। এভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক বহুমুখী সাঙ্গীতিক কর্মধারার সূচনা হয়। রামলোচনের প্রোথিত বীজ দ্বারকানাথের সময় অংকুরিত হয়, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে তা বহু শাখয়িত হয়ে পল্লবিত হয়।

সন্তানদের সংগীতশিক্ষার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার সার্থক রূপায়ণ হয়েছিলো পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। দ্বিজেন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন সুরকার, গীতিকার, স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবক ও সংগীতচিন্তাবিদ। দেবেন্দ্রনাথ যে সব ভারত বিখ্যাত কলাবতগণকে বাড়িতে সংগীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী ও যদুভট্টের নিকট দ্বিজেন্দ্রনাথ রাগসংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য সংগীতেও তাঁর চমৎকার দখল ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগীতদক্ষতার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে জানিয়েছেন "বড়দাদা বিলিতি বাঁশী বাজাতেন। কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অংক দিয়ে এক একটি রাগিণীর সুর মেপে নেবার জন্য।" ফ্লুট অর্গান ইত্যাদি বাজানোর সুন্দর হাত ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ঠাকুরবাড়ির সখের থিয়েটারের কনসার্টে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলিতি বাঁশী বাজাতেন। কোলকাতার প্রথম দিককার হারমোনিয়াম বাদকও ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রনাথ পন্ডীত ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য ও গীতিকুশলতা এই উভয় ধারার মিলন ঘটেছিল তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে। রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ব্রহ্মসংগীতে গীতিময়তা এবং কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বকথার প্রাধান্যই ছিল বেশী। পাপ পূণ্যের হিসাব নিকাশ, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থূল ভীতিপ্রচার এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের শরণাগতি প্রার্থনাই ছিল এই সব গানের বিষয়বস্তু। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে এসে ব্রহ্মসংগীত ঈশ্বরের স্থূল ভীতিপ্রচারের হাত থেকে কাব্যময় রূপ লাভ করে। পরকাল সম্বন্ধে ত্রাস এবং ভীতির মাধ্যমে ঈশ্বরানুগত্যের চেষ্টা তাঁর গানে ছিল না। ভাবসমৃদ্ধ ব্রহ্মসংগীত রচনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথকৃত দুটি ব্রহ্মসংগীতের প্রথম চরণ উল্লেখ করা হল "কর তাঁর নাম

গান/যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ," "জাগো সকল অমৃতের অধিকারী/নয়ন খুলিয়ে দেখো করুণানিধান পাপতাপহারী"।

সংগীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তাঁর বাংলা স্বরলিপি উদ্ভাবন প্রচেষ্টা। সমসাময়িক কালে বাংলা গানকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলা স্বারলিপি উদ্ভাবন প্রচেষ্টা চলছিল বিভিন্ন মহল থেকে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রথম দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশের কিছুদিন পর দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্বজনবোধ্য কসিমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন। কসি অর্থাৎ হাইফেন দিয়ে মাত্রা নির্দেশিত হত বলে এর নাম হয় কসিমাত্রিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কসিমাত্রিক স্বরলিপি বেশ কিছুদিন অনুসৃত হয়। পরে এই স্বরলিপি পদ্ধতি পরিমার্জিত ও কিছুটা পরিবর্তিত করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

মহর্ষির প্রথম পুত্রের মতো দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত, এই উভয়বিধ সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যতি ছিল মূলত দেশাত্ববোধক গান রচনা করার জন্য। ব্রাহ্মমন্দিরের সংগীত চর্চ্চায় তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ব্রহ্মসংগীতে রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীত এমন একটা সহজ কবিত্ব ও ভাবগভীরতা ছিল যে তা সকলকেই স্পর্শ করত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন "তাঁহার রচনায় এমন একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে এমন মাখামাখি ছিল যে তাহা সকলেই স্পর্শ করিত" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, প্রমুখ সংগীতগুণীর শিষ্য ছিলেন। রাগ সংগীতের পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য সংগীতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ ও ঠাকুরবাড়ির উপাসনাসংগীতে অর্গান বাজাতেন। ১১ই মাঘের অনুষ্ঠান মাঘোৎসব ছিল মূলত সংগীত প্রধান উৎসব। শুধু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা নয়, ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবের গান শোনার জন্য কোলকাতার সাধারণ লোকজনও এসে জড়ো হতেন। সত্যেন্দ্রনাথ কোলকাতা থাকা অবস্থায় এই অনুষ্ঠানের প্রধান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন

করতেন। ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক কার্যক্রম হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র বাংলা দেশাত্ববোধক গান বেশ বিকাশ লাভ করে। সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায়, বিশেষ করে এর সাঙ্গীতিক কর্মসূচীতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাঁর রচিত হিন্দুমেলায় জাতীয় সংগীত "জয় ভারতের জয়" গানটি যে যুগে দেশে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিবাদী। বাড়ির অনেক প্রাচীন প্রথার তিনি পরিবর্তন সাধন করেন। কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্য তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, বালক রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি বিষয় উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাতেন।

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে নানা গুণের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি ভারতীয় সংগীতের একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়কেরা বা ওস্তাদরা যেভাবে দিনরাত সংগীত সাধনা করে থাকেন, হেমেন্দ্রনাথ তেমনি দিনরাত অনুশীলন করতেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মেজোদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত[৪]।" ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে সংগীত শিক্ষার (শুধু সংগীত নয়, অন্যান্য সব বিষয়ের) ব্যাপারে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হেমেন্দ্রনাথ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাহিত্য সংগীত শিক্ষার ব্যাপারেও নানারকম আয়োজন করেছিলেন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গীতশিক্ষার জন্যও তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। যা তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত অভাবিত বিষয় ছিল। কন্যা প্রতিভা দেবীকেও তিনি অতি অল্প বয়স থেকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষায় পাকা করে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিভাদেবীর নিজের উদ্ধৃতি দেয়া যাক-"তখনকার কালে মেয়েদের গান বাজনা করিবার প্রথা ছিল না। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিতেন, শিখাইতেন[৫]।" বাড়ির মেয়েদের সংগীত চর্চ্চা বিষয়ে সরলা দেবী "জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে বলেছেন "আজকাল বাংলাদেশের মেয়েদের সংগীতবিদ্যা বিশারদতায় কেউ কি কল্পনা করতে পারেন? এমন ছিল যখন এই বাংলায় ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সংগীত চর্চ্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, যখন নিজের বাড়িতে মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল। তাইত ১১ই মাঘে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গানের

আকর্ষণে কোলকাতা শহর ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু সে গান ধ্রুপদী চালের গাম্ভির্য রক্ষা করা গান- সে পেশাদারী গায়িকাদের টপ্পা -ঠুংরী-খেয়ালের চিত্তবিঘুর্ণক গান নয়[৬]।"

ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের মধ্যে সংগীতের দিক থেকে হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী, স্বর্ণকুমারীর কন্য সরলাদেবী এবং সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরাদেবী সে যুগে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছিলেন। এরা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং ইউয়োরোপীয় সংগীত উভয় ধারাতেই পারদর্শিনী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সংগীতশিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সৃষ্ট এই পথ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে গ্রহণ করে ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসংগীত যে কয়জন গুণীর অবদানে নবরূপ লাভ করেছিলো, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের কথা বাদ দিলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সর্বপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ঠাকুরের অভ্যুদয়। তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক, যন্ত্রসংগীতশিল্পী, সংগীতরচয়িতা, সুরকার, স্বরলিপি উদ্ভাবক, সংগীতপত্রিকা প্রকাশক, সংগীত সংগঠক। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, মৌলা বক্স, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উচ্চমানের গুনীদের সাঙ্গীতিক সাহচর্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথও প্রথাগত তালিম গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্বভাবজাত সংগীত শক্তি এসব গুণীদের সাহচর্যে পল্লবিত হয়েছিলো। শুধুমাত্র সেতারবাদনেই জ্যেতিরিন্দ্রনাথ প্রথাগত তালিম পেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বোম্বাই অবস্থান কালে তিনি ওস্তাদ রেখে সেতারবাদন শিখেছিলেন।

বেহালা, পিয়ানো, হারমোনিয়ম ইত্যাদি বাদনের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট হাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পিয়ানো ছিল। অবসরমতো এই পিয়ানোতে চর্চ্চা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাদনে সিদ্ধহস্ত হন। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে *"বাল্মীকি প্রতিভা"* রচনার সময় পিয়ানোতে 'জ্যোতিদাদার অঙ্গুলিনৃত্যের' বিবরণ হতে তাঁর পিয়ানো বাদন ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হারমোনিয়ম বাদনও একইভাবে শেখা, ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম বাজাতেন। এছাড়া ঠাকুরবাড়িতে অবস্থানরত বোম্বাই অঞ্চলের গায়ক মৌলা বক্স এর সাথেও তিনি হারমোনিয়ম বাজাতেন। যন্ত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল ক্ষেত্র ছিল কণ্ঠসংগীত। পাশ্চাত্য সংগীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল সংগীত প্রবণতা ছিল ভারতীয় রাগ সংগীত। তবে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে ওস্তাদদের সাহচর্যে স্বাভাবিক আহরনী ক্ষমতা বলে তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন। গীতরচনার ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন। ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশী সংগীত, প্রীতিগীতি, নাট্য-সংগীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সংগীত রচনা করেন। ব্রহ্মসংগীত রচনায় সংখ্যার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান। আদি ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি গ্রন্থমালা'য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত ব্রহ্মসংগীত সংখ্যা একষট্টি। তবে এটি তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীত এর মোট সংখ্যা নয়। বিভিন্ন স্থানান্তরে তাঁর অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভাঙা গান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাঙাগানের যে প্রচলন করেছিলেন সেটাই জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ঠাকুরের হাতে এসে একটি স্পষ্টরূপে ধারণ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দুস্তানী গানের সংগ্রহ ছিল বিশাল, তাঁর সংগৃহীত অনেক গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অনেক গান রচনা করেছিলেন। ভাঙ্গাগান রচনা সম্পর্কে জ্যেতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন "কি সৌখীন কি পেশাদার, কোন গায়কের গান ভাল লাগিলেই অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া আমরা ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতে বসিতাম[৮]।" বাংলা দেশাত্ববোধক গান রচনার ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ অবদান রাখেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িকে কেন্দ্র করেই হিন্দুমেলা তথা বাংলা দেশাত্ববোধক গান রচনার সূত্রপাত হয়। হিন্দুমেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল। পাশাপাশি সঞ্জিবনী সভা নামে একটি সভা তিনি গড়ে তোলেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার স্বাদেশিক গানের অনেক গুলিই এই সভাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। হিন্দুমেলা পর্বেই ১৮৭২ সালে কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন ঘটে। এই সাধারণ রঙ্গালয়কে

কেন্দ্র করে কোলকাতায় স্বদেশী নাট্যরচনার জোয়ার বয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটকে স্বদেশী গান রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জাতীয়সংগীত' নামে বাংলাভাষায় রচিত প্রথম স্বদেশী গানের সংকলন প্রকাশ করেন। এতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন বসুর গান অন্তর্ভূক্ত হয়। এই সংকলনে দ্বিতীয় সংস্কারণে অন্যান্যের মতো রবীন্দ্রনাথের গানও অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো।

সংগীত গবেষক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে আকারমাত্রিক স্বরলিপি। বাংলা গানের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকেই স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছিল। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দন্ডমাত্রিক এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কসিমাত্রিক এর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিই একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্থায়ীরূপ লাভ করে। এই স্বরলিপি বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একশটি গানের আকারমাত্রিক স্বরলিপি সম্বলিত 'স্বরলিপি শত গ্রন্থমালা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর পর থেকে ভারত সংগীত সমাজের মাসিকপত্র 'বীণাবাদিনী'তে আকারমাত্রিক স্বরলিপি নিয়মিত প্রকাশিত হত।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানস গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁরই প্রেরণা ও তত্ত্বাধানে রবীন্দ্রনাথের "গান বাধিবার শিক্ষানবিশী" শুরু হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনায় ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চ্চায় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের ভূমিকার কথা বলা হল। রবীন্দ্রনাথের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ছেলেবেলার সংগীতচর্চ্চা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন-

"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকাল গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া

সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আনন' গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে [৯]।"

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানস উৎকর্ষিত হয় ব্রাহ্ম সমাজের সংগীত চর্চ্চার মাধ্যমে, ঠাকুরবাড়িতে আশ্রিত বিভিন্ন গুনী ওস্তাদদের সংগীতচর্চ্চা ও শিক্ষণের মাধ্যমে, অগ্রজদের উদারনৈতিক সংগীত চর্চ্চার মাধ্যমে। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন খাতনামা শিল্পীদের কাছে, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা শেখার এ শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার জন্য ব্রহ্মসংগীত রচনা রবীন্দ্রাগ্রজদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভা গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত গুরু। বিষ্ণু চক্রবর্তী বাংলা ছড়ার মাধ্যমে সহজ তালে রাগ রাগিণীর সুর বসিয়ে শিশুদের শেখাতেন। এতে প্রথমেই সা, রে, গা ইত্যাদি নীরস অভ্যাসের দ্বারা শিশুমন বিষিয়ে উঠত না। পরবর্তী জীবনে স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বিষ্ণু চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করেছেন। শিশু বয়সে যারা কবির মনে সাঙ্গীতিক প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরেকজন উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ ছিলেন যদুভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য)। দীলিপ কুমার রায়ের সাথে আলাপ আলোচনায় যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

'ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল ঠোকাঠুকি করত না। বাংলাদেশে এ রকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর গানে একটা Originality ছিল'[১০]।

অগ্রজদের সংগীতচর্চ্চা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু উক্তি তুলে ধরছি।

'বড়দাদা, মেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলে মানুষ আমাদের তথায় প্রবেশ ছিল না।"

তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল[১২]।'

'মেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাজছেনই গলা সাধছেন তো সাধাছেনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত'।

'মেসদাদা বেহাগ আওড়াচ্ছেন' 'অতিগজগামিনীরে আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে দিচ্ছি"। (ছেলেবেলা)

'ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখনকার নামকরা সেতারী জুয়ালাপ্রসাদ এর কাছে সেতার শিখেছিলেন। এছাড়া তিনি ভাল ধ্রুপদও গাইতে পারতেন। সারদাপ্রসাদের বৈঠকে বহু গায়ক বাদকের আসর বসত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সংগীত কর্মধারায়, সংগীত চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছিলো ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির সংগীত পরিবেশেই।

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।	করুণাময় গোস্বামী	রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা বাংলা একাডেমী ঢাকা ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩ সংস্করণ।	১
২।	প্রাগুক্ত		২
৩।	ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০	৫৯
৪।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)	৩১
৫।	ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত লোকগীতি, কীর্তন উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব	৬৬
৬।	প্রাগুক্ত		৬৬
৭।	করুণাময় গোস্বামী	বাংলা গানের বিবর্তন বাংলা একাডেমী। জুন- ১৯৯৩	২৯৬
৮।	ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০	৭৪
৯।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)	৯১
১০।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)	৩১

রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন গীতশৈলীর প্রভাব

রবীন্দ্রসংগীতে রাগসংগীতের প্রভাবের বীজ উপ্ত হয়েছিল বাল্যজীবনে ঠাকুর বাড়ির সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চ্চার এক প্রাণবন্ত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। সংগীতের চর্চ্চা ঠাকুর বাড়িতে আরো তিন পুরুষ আগে রামলোচন ঠাকুরের সময় থেকেই চলে আসছিল। এই সংগীত চর্চ্চা সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয় দেবেন্দ্রনাথের সময়ে। দেবেন্দ্রনাথের আমলে সংগীত চর্চ্চা উৎকর্ষিত হয় ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে, ঠাকুর বাড়িতে আশ্রিত বিভিন্ন গুণী ওস্তাদদের চর্চ্চা ও শিক্ষণের মাধ্যমে এবং তাঁর সন্তানদের উদারনৈতিক সংগীতচর্চ্চার মাধ্যমে। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পীদের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা শেখার ও শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনার জন্য ব্রহ্মসংগীত রচনা রবীন্দ্রাগ্রজদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল। এই ব্রহ্মসংগীতের সুর করা হত উচ্চাঙ্গ সংগীতগুণীদের সহায়তায় বিভিন্ন হিন্দি ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর ভেঙ্গে। ছেলেবেলায় সংগীত চর্চ্চা সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কবি বলেছেন, "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অপ্রতুল প্রেম আননে' গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"[১]

ধ্রুপদাঙ্গের এই ব্রহ্মসংগীত শিশু রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা এই ঘটনার উল্লেখে বেশ ধরা পড়ে।

বিভিন্ন স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বিষ্ণু চক্রবর্তীর উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীকে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে লেখা কিছু কথা তুলে ধরছি-

	রচনাকাল (খ্রীঃ)
দেশাত্ববোধক-	
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ	১৮৭৭
ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি	১৮৭৮
ঢাকোরে মুখচন্দ্রমা জলদে।	১৮৭৮
ভানুসিংহের পদাবলী-	
শাঙন গগণে ঘোর ঘনঘটা	১৮৭৭
গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে	১৮৭৭
সতিমির রজনী সচকিত সজনী	১৮৭৭
প্রেমের গান-	
বলি ও আমার গোলাপ বালা	১৮৭৮
শোনগো নলিনী খোল গো আঁখি	১৮৭৮
ব্রহ্মসংগীত	
তুমি কিগো আমাদের পিতা	১৮৮০ খ্রীঃ
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত	১৮৮০ খ্রীঃ
বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১ খ্রীঃ
আজকে তবে মিলে সবে	
এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে	
এখন করব কী বল্	
শোন তোরা সবে শোন।	

উপরোক্ত গানগুলির বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশাত্ববোধক গান, প্রেমের গান ও ব্রহ্মসংগীতগুলিতে কবির ব্যাক্তিগত ভাবাবেগই প্রকাশ পাচ্ছে। 'তোমারি তরে সঁপিনু মা।' গানটিতে কবি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিবেদন করছেন। দ্বিতীয় দেশাত্ববোধক গানটিতে প্রকাশিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরবতায় দেশমাতৃকার প্রতি ধিক্কার। উল্লিখিত দুটি প্রেমের গানেই দেখা যায় ব্যক্তিগত, মানবীয়, প্রেমানুভূতির আবেগময় প্রকাশ।

ভানুসিংহের পদাবলীতে অবশ্য বেশ কিছু সুন্দর চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। প্রেমের গানের মতই উল্লিখিত ব্রহ্মসংগীত দুটিতেও কবি 'পিতা' সম্বোধনে ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক শরণ প্রার্থনা করেছেন। *'বাল্মীকি প্রতিভা'*কে বলা যায় কবির প্রথম বয়সের সংলাপধর্মী ভাববাদী সংগীতচিন্তার প্রায়োগিক প্রকাশ। *'বাল্মীকি প্রতিভা'* কে কবি বলেছেন 'সুরে নাটিকা'।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে লিখিত 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' এ কবি সংগীত কলার নিজস্ব মাধুর্যের কথা স্বীকার করলেন। কবি বললেন 'রাগিণী যেখানে শুধুমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।' সংগীতের উদ্দেশ্যবাহকতার ক্ষেত্রে কবি ভাবের বাহনের চেয়ে রূপের প্রকাশধর্মীতার প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। কবি স্বীকার করলেন- 'যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয় আজ তাহা স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে, গানে যেখানে কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া। সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজেই ঐশ্বর্যে বড়, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে'। 'অন্তর বাহির' (২৫ জৈষ্ঠ-১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে কবি বললেন "সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়'। সংগীতের ভাবাবেগ প্রকাশের বিপরীত সূত্র হিসাবে কবি বললেন 'গানতো স্বভাবের নকল নহে'। 'অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই'। '..... কারণ বাহিরের দিকে যাহা আবেগ অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য'। ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে কবি বললেন 'উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্যে নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহবল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা' (১৩ই জুলাই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পত্র)। নিজের গান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন- 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয় রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন 'কেন বাজাও কাকন কন কন কত ছলভরে' এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার

রূপলীলা। ভাব প্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে। রূপ প্রকাশ অহৈতুক। (১৩ই জুলাই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পত্র)।

প্রথম বয়সে কবি যে সংগীতকে ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপে দেখেছেন, পরিণত বয়সে তাতেই প্রকাশ করেছেন 'কল্পনার রূপলীলা' রমা রলাঁর সাথে আলোচনায় কবি বলেছেন যে, আবেগ শুধুমাত্র সৃষ্টির উপলক্ষ্য বা অনুপ্রেরণা জোগাবে। সৃষ্ট রূপের মধ্যে আবেগের প্রকাশ থাকবে সীমিত। উপলক্ষ্য, হেতু বা প্রয়োজন ইত্যাদি ছাড়িয়ে রসের রাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়াতেই সৃষ্টির সার্থকতা। (The purpose of art is not to give expression to emotion but to use it for the creation of significant form... Emotion only supplies the occation, which makes it possible to bring forth the creative art) - Conversation with Roma Rolland, 24th June-1926 Villeneuve, Jermany).[১]

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা কবির প্রথম বয়স, বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং পরিণত বয়স, পঞ্চাশোর্ধ বয়সের প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছি। মাঝখানের এই বিশ, পঁচিশ বছর সময়েও কবি অনেক গান রচনা করেছেন, সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন চিঠিতে, সাহিত্যে, কবিতায়। চুয়াত্তর বছর বয়সে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে কবি রূপবাদী গানের উদাহরণ স্বরূপ যে গানের উল্লেখ করেছেন (কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছলভরে) তা মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লেখা। দেখা যাচ্ছে একেবারে প্রথম জীবনে অর্থাৎ 'বাল্মিকি প্রতিভা'র যুগ বা 'সংগীত এ ভাব' 'সংগীত ও কবিতা'র যুগেই কবি সংগীত ভাববাদের জোড়ালো প্রবক্তা ছিলেন। সংগীতে রূপধর্মীতাকে কবি অল্প দিনের মধ্যেই গুরুত্বের সাথে দেখেছেন।

'রূপের বাহন' বা 'ভাব বাৎলাবার জন্য নয়' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? কবির পরিণত বয়সের গান কি ভাবলেশহীন বিশুদ্ধ, 'বিমুর্ত রূপের প্রকাশ'? এতে কোন সন্দেহ নেই, কবির পরিণত বয়সের গানে কথার অংশ বাদ দিয়ে শুধু সুরে গাইলেও 'অবিমিশ্র সংগীতের

আনন্দ' পাওয়া যাবে, গানগুলিকে এক একটি "Complete Aesthetic form" বলা যাবে। তবুও কথার গুরুত্ব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে রবীন্দ্রসংগীতে, তা সে প্রথম বয়সের গানই হোক আর শেষ বয়সের গানই হোক। ভাবাবেগের ভিত্তিভূমিতে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবন। এই সংগীতলীলা এসে পৌছেছে নান্দনিক রূপবাদে। এই নান্দনিক রূপবাদ কতটা Musical Configuration (সংগীতের বিমূর্তরূপবাদ) আর কতটা Imegery (চিত্রকল্প) এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই আমাদের আলোচনা।

১৯ বছর বয়সে পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের, ভাবাবেগধর্মীতা, সংলাপধর্মীতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বাল্মীকি প্রতিভা, (১৮৮১) জীবনের শেষ পর্যায়ে ৭৭ বছর বয়সে রচনা করেন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা। উল্লেখ্য শ্যামার বিষয় বস্তুও সুরে সংলাপধর্মীতা। কিন্তু পাশাপাশি বিচার করলে বোঝা যায় বাল্মীকি প্রতিভায় যেমন সংলাপের ভাবাবেগ প্রকাশ করাই সুরের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্যামার তেমন নয়, যথেষ্ট নাটকীয় হলেও, শুধুমাত্র নাট্যরূপ প্রকাশই নয়, গানগুলি যেন কাব্যিক সংলাপের গীতিময় প্রকাশ। কথার অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুরের উপজীবিতাও কম নয় 'শ্যামা নৃত্যনাট্যে?

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার, সংগীতসৃষ্টির স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গেলে তাঁর সমগ্র সংগীত জীবনের ভাবনা চিন্তার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'আত্ম পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন- "নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বছরে পৌছবার অবকাশ না দিতেন তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করার অবকাশ পেতাম না।"

জিনতত্ত্বের হিসেবে মানুষ তার অর্জিত দোষগুণের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ প্রাপ্ত হয় পূর্ব পুরুষ থেকে। শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। পূর্বপুরুষের আচরিত শিল্প সংস্কার, শৈশবের পরিবেশে যথেষ্ট প্রভাবিত করে সামাজিক মানুষকে শৈশবে আচরিত ধারায়ই বেড়ে উঠে শিশু ক্রমে তাঁর সাথে যুক্ত হয় স্বাতন্ত্র্য, বাক্তিত্ব।

'বিষ্ণুর গানের একটি বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান অলংকারের প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া কথার যে একটা মূল্য আছে সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত।' [২]

শিশু বয়সে যাঁরা কবির মনে সাংগীতিক প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরেকজন উল্লেখ্যযোগ্য সংগীতজ্ঞ ছিলেন যদু ভট্ট (যদুনাথ চট্টাচার্য)।

খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদ শিল্পী যদুভট্ট বেশ কিছু গানও রচনা করেছিলেন। কবি পরবর্তী জীবনে তাঁর হিন্দি গানের অনুকরণে বাংলা গান রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অগ্রজদের সংগীতচর্চ্চা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু উক্তি উল্লেখ করছি–

'বড়দাদা সেজদাদা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলেমানুষ আমাদের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। ..... তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল।' [৩] 'সংগীত- (সংগীতচিন্তা)।

'সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।' [৪] 'সংগীত' -সংগীতচিন্তা।

'সেজদাদা বেহাগ আওড়াচ্ছেন "অতিগজ গামিনীরে" আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি।" [৫] -ছেলেবেলা।

মেজদাদা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইদের মধ্যে প্রথম হিন্দি ভাঙ্গা গান রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরবাড়িতে যেমন হিন্দুস্তানী সংগীতচর্চ্চা করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বোম্বাই বাসকালে সেতারও শিখেছিলেন।

ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখনকার নামকরা সেতারী জুয়ালাপ্রসাদের কাছে সেতার শিখেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ভাল ধ্রুপদও গাইতে পারতেন। সারদাপ্রসাদের বৈঠকে প্রায়ই বহু গায়ক ও বাদকের আসর বসত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশেষ সমঝদার ছিলেন। নিজে খুব ভাল গাইতে না পারলেও বিডন স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া করে ওস্তাদ রেখে গান বাজনা শিখেছিলেন। তাঁর রচিত সব ব্রহ্মসংগীতই রাগসংগীতের বিশেষ করে ধ্রুপদী সংগীতের চালে রচিত। তাঁর ইচ্ছা ও প্রভাবে তাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের হিন্দিসংগীত ভেঙ্গে বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের গান সম্বন্ধে বলেছেন, "আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর ছোট ছোট টুকরাগুলি পাইয়াছি। সুতরাং যে ভাবেই গান রচনা করি না কেন এই রাগরাগিণীর রসটি তাহার সঙ্গে মিশিয়ে থাকিবেই।"[৬]

হিন্দুস্থানী সংগীত রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সংগীত চেতনাকে কতটা প্রভাবিত করেছিলো এই উক্তি থেকে তা ধারণা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সংগীতমহীরুহে রাগসাংগীতিক প্রভাবের বীজ উপ্ত হয়েছিল ছেলেবেলায় ঠাকুর বাড়ির সংগীত পরিবেশেই।

রবীন্দ্রসংগীতে রাগসংগীতের প্রভাব

রবীন্দ্র সংগীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবি প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৮০টি রাগ ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। এর মধ্যে মোটামুটি ২০টি রাগের প্রাধান্য দেখা যায়। যথা- টোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, ভৈরোঁ, কালেংড়া, সারং, ভূপালী, ইমনকল্যাণ, ছায়ানট, বেহাগ, কাফী, খাম্বাজ, রাগেশ্রী, বাহার, পরজ, দেশ, পিলু, কানাড়া, আড়ানা, পূরবী, মূলতান ও মল্লার।

রাগরাগিণীর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ বিষয়টি তাঁর মনে প্রথম উদয় হয়েছিল ১৮৮১ সালে। বেথুন সোসাইটি আয়োজিত সংগীত বিষয়ক সেমিনার 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক বক্তৃতায় কবি বলেন, "কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উদয় হয়, সংগীতবেত্তারা তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করুন।"[৭] রবীন্দ্রনাথ রাগের ভাবরূপ সুরের রসকল্পনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাগের বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি কাঠামোগত শুদ্ধতার প্রতি নয়। প্রথম জীবনের দুই একটি ভাঙ্গা গান ছাড়া পরবর্তী জীবনের বেশীর ভাগ গানেই দেখা যায় ব্যাকরণগত শুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি। কথার ভাব প্রকাশের কারণে এক রাগের সাথে অন্য রাগ মিশে গেছে।

হিন্দুস্থানী সংগীতকে কবি কীভাবে অনুভব করতেন তা তাঁর এই সম্বন্ধে কিছু উক্তি থেকে বোঝা যায়,

'ভৈরো' যেন ভোর বেলাকার আকাশের প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশিথীনির পথবিস্মৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গীবিহীন অসীমের চির বিরহবেদনা, মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিঃশ্বাস, পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।'[৮]

উচ্চাঙ্গসংগীতের একটি নির্দেশ কবি মোটামুটি মেনে চলতেন তা হচ্ছে রাগরাগিণীর সময়। তাঁর যে গানে সকালের কথা আছে তাতে তিনি সকালের রাগ ব্যবহার করেছেন। যেমন-'মনমোহন গহনযামিনী শেষে দিলে আমারে জাগায়ে' (আশাবরী), সন্ধ্যার কথায় দেখি ইমন বা পূরবী। যেমন- যেমন সন্ধ্যা হল গো ওমা- (পূরবী)। রাত্রির কথায় বেজে ওঠে বেহাগ, কানাড়া বা খাম্বাজ। যেমন– বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি– (কাফীকানাড়া)। নিবিড় অমা তিমির হতে– (বেহাগ)। বর্ষার গানে দেখা যায় মল্লার–'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে', 'গহনঘন ছাইল গগণ ঘনাইয়া'। বসন্ত ঋতুর গানে ব্যবহার করেছেন বাহার রাগ– 'বকুল গন্ধে বন্যা এল– (বাহার), ও চাঁদ তোমায় দোলা– (বাহারখাম্বাজ)। শরতের সকাল বিশেষ

রমণীয়। কবির শরৎ বর্ণনায় বেশীর ভাগ গানে সকালের রাগিণীর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন 'সকাল বেলার আলোয় বাজে, বিদায় ব্যথার ভৈরবী'।

রবীন্দ্রসংগীতের রাগরাগিণী আলোচনায় একটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, বর্তমান কালে উচ্চাঙ্গসংগীতে যে মতটি প্রাধান্য পাচ্ছে সে মতে এর বিচার করা উচিত নয়। তৎকালে কোলকাতায় বিশেষ করে ঠাকুরবাড়িতে যে ধারায় উচ্চাঙ্গসংগীতের চর্চা হত তারই প্রভাব গুরুদেবের গানে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য এই সময় ঠাকুরবাড়িতে বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীত ধারার প্রাধান্য ছিল। কয়েকটি গানের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির আলোচনা করা যাক।

'মনমোহন গহনযামিনী শেষে', 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও', আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'। আশাবরী রাগের এই তিনটি গানের সুর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'র' 'ঋ' উভয় স্বরই ব্যবহৃত হয়েছে। রামকেলী আশ্রিত গানে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার নেই। উদাহরণ স্বরূপ 'মোরে ডাকি লয়ে যাও', 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে', গান দু'টি উল্লেখ করা যায়। এরূপ আরো বেশ কিছু রাগের উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন– বেহাগে 'পক্ষগম' স্বরবিন্যাস নেই, পূরবীতে রচিত গানে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার। ভৈরবী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় রাগ। এই রাগে কবি বহু গান রচনা করেছেন। শুদ্ধ, কোমল মিলিয়ে ১২টি স্বরই কবি এই রাগের গানে ব্যবহার করেছেন।

ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা বিভিন্ন শৈলীতে কবি গান রচনা করেছেন। ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন অঙ্গের তাল। তবে ধ্রুপদ সংগীতই কবির রচনায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী কবি। সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলি পাইয়াছি। সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রূপটি তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিবেই।' সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত জুড়ে কোন না কোন ভাবে মিশিয়ে আছে। রাগরাগিণীর ছোট ছোট টুকরা, স্বরসংগীত। কখনো তা প্রত্যক্ষ কখনো

বা পরোক্ষ, ভারতীয় রাগসংগীতের প্রাণলোক থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তিনি ভেঙ্গেছেন এর জড়ত্বের বন্ধনকে, বর্জন করেছেন বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি কাঠামোগত ব্যাকরণগত শুদ্ধতা। গ্রহণ করেছেন এর ভাবরূপ, সুরের রসকল্পনা।

তাঁর গানে তিনি বিভিন্ন সংগীত ধারাকে গ্রহণ করলেও তাঁর সংগীতাদর্শ ছিল ধ্রুপদীয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে কবি বলেছিলেন, 'জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী সংগীত জানিনে, বুঝিনে। আমার আদি যুগের রচিত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পদ্ধতির সাক্ষ্য দিল অতি শুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাক বিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছি। ইচ্ছে করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখান করতে পারিনে।' অন্য একটি পত্রে কবি বলেছেন, 'আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত। তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে দু'টো জিনিস পেয়েছি। এক দিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর এক দিকে তার আত্মদমন। সুসঙ্গতির মধ্যে ওজন রক্ষা করা এই দু'টি উক্তি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গান থেকে কতটা প্রেরণা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব আলোচনার প্রথমে রবীন্দ্রজীবনে এর প্রেরণার উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে এক জমজমাট রাগসাংগীতিক পরিবেশে। ঠাকুরবাড়িতে যারা সংগীতগুণী রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন বিশিষ্ট ধ্রুপদ গায়ক। ঠাকুর বাড়িতে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ চর্চ্চার পাশাপাশি আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে কেন্দ্র করে নিয়মিত রচিত ও গীত হত ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত। সংগীত রচনার প্রাথমিক যুগেই তাঁর গানে প্রযুক্ত হয়েছিল এই ধ্রুপদসাংগীতিক আদর্শ। ধ্রুপদের আদর্শ খুব সহজেই মিশে গিয়েছিল তাঁর সংগীত চেতনায়।

ধ্রুপদ সংগীতের গভীরতা, আত্মদমন ও সুসংগতি তিনটি আদর্শ কবি তাঁর গানে ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি, গান রচনার প্রথম যুগেই তাঁর সংগীত চেতনায় নিহিত ছিল কাব্য সংগীতের আদর্শ। প্রথম যুগের ধ্রুপদ ভাঙ্গা গানের ক্ষেত্রেও, ধ্রুপদ সুরকে নিজের

কথায় (গানে) প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি ধ্রুপদের সুর এবং এর গঠনগত নান্দনিক রূপটিকেই গ্রহণ করলেন কাব্যভাবের সুরময় পরিস্ফুটনের জন্য। বর্জন করলেন এর বিস্তার, বাট, লয়কারী ইত্যাদি আলংকারিক বিষয়গুলোকে। প্রতিটি স্বরের অবস্থান, ওজন, ভাব ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সেজন্য রবীন্দ্রনাথের গানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে শুধু ধ্রুপদাঙ্গিক রবীন্দ্রসংগীতের জন্য প্রযোজ্য তা নয়। কথা ও সুরের সুসঙ্গতিময় এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসংগীতের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়।

গানের স্তবক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। ধ্রুপদ গান চার তুক বা স্তবকে গঠিত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতেও এই চার স্তবক রীতি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা গান সুরের বিবেচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই স্তবকেই বিভক্ত ছিল। স্তবক দুইয়ের বেশী হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তরার সুরের পুনরাবৃত্তি হত। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বা সমসাময়িক গীতিকারদের মধ্যে কারো কারো রচনায় এই চার তুক গঠন করা লক্ষ্য করা গেলেও রবীন্দ্রনাথই তাঁর সংগীতে এই ধারার যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই রীতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

উদাহরণ স্বরূপ কিছু ধ্রুপদ ভাঙ্গা ও ধ্রুপদাঙ্গিক রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম চরণ উল্লেখ করা হল।

রবীন্দ্রসংগীত (ভাঙ্গা গান)	**মূলগান**	**রাগ, তাল**
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা	বহুরা বাজাও বংশী	পূরবী, তেওড়া
আজি বহিছে বসন্ত পবন	আজু বহত বসন্ত	বাহার, তেওড়া
আনন্দ তুমি স্বামী	ওংকার মহাদেব	ভৈরবী, সুরফাঁক্তা

ধ্রুপদ গান

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে	-	মিশ্রকেদারা, চৌতাল
আমার প্রাণে গভীর গোপন	-	মেঘ, তেওড়া
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে	-	পরজবসন্ত, রূপকড়া

রবীন্দ্রসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কোলকাতা তথা বাংলাদেশের শিক্ষিত বাঙালী শিল্প ও সংগীতরসিক উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীত ছাড়া অন্যতর কোন লঘু বাংলা সংগীতকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করতেন ওই সব গানের সংস্রব রাখাকে মর্যাদা হানিকর বলে মনে করতেন। তখন প্রচলিত কীর্তন ও রামপ্রসাদী গানের চলন কিছু কিছু থাকলেও, এই সংগীত চর্চ্চা উচ্চ অঙ্গের মর্যাদা পেত না। রবীন্দ্রনাথের হাতেই পল্লীবাংলার লোকায়ত সুর নাগরিক সংগীত সংস্কৃতিতে মর্যাদার আসন পায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন কেটেছে পরিবারের উচ্চাঙ্গসংগীতের আবহাওয়ায়। বাড়িতে যাত্রাগান, পাঁচালী, কথকতা, ঢপকীর্তন প্রভৃতির আসরও মাঝে মাঝে বসত এবং এ সবের মধ্য দিয়ে পল্লী বাংলার লোক সংগীতের ধারাগুলির সাথে সামান্য পরিচয় তাঁর হয়েছিল। এছাড়াও ব্রজেশ্বর চাকর, কিশোরী চাটুজ্যে, এদের কণ্ঠে বালক বয়সে রামায়ণ গান, পাঁচালী এসব শুনেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে হিন্দুস্থানী সুরের ছকেই গান বাঁধতেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক সংগীতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন ১৮৯১ সালে, যখন তিনি জমিদারী সূত্রে শিলাইদহে আসেন গ্রাম্য বাংলার কীর্তন, কীর্তনীয়াদের সংস্পর্শে আসেন, শিলাইদহের বাউল, ফকিরদের দেখেন ও তাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। এই সব লোকায়ত গানের ভাব ও সুর তাঁর গানের জগতে এক নতুন আলোড়ন তোলে। এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রায় চারশো গান রচনা করেন। এর মধ্যে লোকসুরে রচিত মাত্র দু'টো গান পাওয়া যায়- 'আমি শুধু রইনু বাকি' (রামপ্রসাদী, বয়স ২০), 'আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি' (কীতর্ন, বয়স ২৩)।

রবীন্দ্রনাথের গানে লোক সুরের বেশ কয়েকটি ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সারি ইত্যাদি লৌকিক সুরগুলি কবি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। লোক সুরে গান রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। স্বদেশজাগৃতির এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন উদ্বেলিত জনআন্দোলনে। এই সময়ে রচিত হয় বেশ কিছু দেশপ্রেমের মন্ত্রে উচ্চারিত স্বদেশী গান যার অনিবার্য বাহন হয়, উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানীয় নয়, পাশ্চাত্য বা প্রাদেশিক নয়, লোকায়ত দেশী সুর। এই সময়ে তিনি বেশকিছু বাউল গান ভাঙেন। এই সময়কার মৌলিক সুরের গানেও বাউলের প্রভাব দেখা যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য মূল লোকগীতিগুলি তিনি যে বয়সে শোনেন তার অনেক পরে তিনি ভাঙেন। লোকসুর ভাঙা বেশ কিছু গানের মূল গান তিনি প্রথম বয়সে তিনি ঠাকুরবাড়িতেই শোনেন (সরলাদেবী চৌধুরাণীর কাছে), শিলাইদহে লোকায়ত জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এবং তৎ পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে তিনি এই সুর ব্যবহারের প্রেরণা লাভ করেন। তবে লোকসুরে সংগীত রচনার এখানেই শেষ না। এর পর থেকে সংগীত রচনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিশে থাকে লোক সংগীতের সুর।

বাংলাদেশে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে বাউল গান এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা লোকসংগীতগুলির মধ্যে বাউলের সুরেই রবীন্দ্রনাথ বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই বিচারে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করছি, 'আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানেই অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'[৭] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগেই রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরে গান রচনার সূচনা, কিন্তু ব্যাপ্তি ছিল সমগ্র সংগীতজীবন।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত স্বদেশী গানের সংকলনের নামকরণ করা হয় 'বাউল'। এই সংকলনে প্রায় প্রতিটি গানেই পাওয়া যায় বাউল তথা লোকসংগীতের সুর। 'বাউল' থেকে মূল গান সমেত কয়েকটি গানের উদাহরণ দেওয়া হল–

রবীন্দ্রসংগীত	মূলগান
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	মন অসার মায়ায় ভুলে রবে (গগণ হরকরা)
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
এবার তোর মরা গাঙে	মন মাঝি সামাল সামাল।

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে কবির সংগীত রচনার ধারায় নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল বাউলের সুর। বাউলের সুরের মধ্যে কখনো দেখা গেছে রাগরাগিণীর ছায়া, কখনো বাউল কীর্তনে একাকার হয়ে মিশে গেছে। জীবনের শেষ বৎসরে দু'টি অবিস্মরণীয় বাউল সুরের গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসংগীতে বাউল সুরের আমৃত্যু ধারাবাহিক প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে রচনাকালসহ কয়েকটি গান উল্লেখ করা হল-

নিশিদিন ভরসা রাখিন- ১৩১২ বঙ্গাব্দ।
ওরে আগুন আমার ভাই ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
এ পথ গেছে কোন খানে গো ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
তুমি যে সুরের আগুন ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ ১৩২১ বঙ্গাব্দ।
এই তো ভাল লেগেছিল ১৩২২ বঙ্গাব্দ।
আমার বেলা যে যায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
আমি কান পেতে রই ১৩২৯ বঙ্গাব্দ।
আমার মন বলে চাই চাই ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

উল্লেখ্য উপরোক্ত উদাহরণগুলো রবীন্দ্রনাথের বাউল সুর নয় প্রভাবিত গানের অত্যন্ত সামান্য অংশ মাত্র। শুধুমাত্র বাউল সুরই বাউলের ধর্মতত্ত্বও প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনাকে। রবীন্দ্রবাউলের প্রাণের মানুষ বাউলের মনের মানুষেরই প্রতিচ্ছবি।

গীতবিতানের প্রত্যেক পর্যায় থেকে দু'টি করে বাউল সুর প্রভাবিত রবীন্দ্রগীতের উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে বাউলের প্রভাব বিষয়ক আলোচনা শেষ করছি।

পূজা

১। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,

২। আমার মন যখন জাগলি নারে।

স্বদেশ

১। ও আমার দেশের মাটি,

২। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।

প্রেম

১। ডাকব না ডাকব না,

২। যা ছিল কাল ধলো।

প্রকৃতি

১। আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়

২। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।

বিচিত্র

১। আমার নাইবা হল পারে যাওয়া

২। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ।

কীর্তন বাংলাদেশের প্রাচীন সংগীত ধারা। দিলীপকুমার রায়ের সাথে 'আলাপ আলোচনায়' রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য বুঝাতে গিয়ে কীর্তনের উল্লেখ করেছেন-'বাংলার সংগীতে বিশেষত্বটি যে কি তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তন গানে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সেতো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।'[৮]

কীর্তন হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদ, যা সুরে তালে গাওয়া হয়। কীর্তন গায়কগণ মূল গানের সঙ্গে স্বরচিত কথার অংশ জুড়ে দিয়ে যে বিস্তার করেন তাকে বলা হয় আখর। হিন্দুস্থানী গানের তানের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'কথার তান'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সংগীতসৃষ্টিতে কীর্তনের ভাবধারা, অর্থাৎ কাব্য ও সুরের পরিপূরক প্রয়োগ বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। কীর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের ভূমিতে এর উৎপত্তি, তার মধ্যেই শিকড়, কিন্তু শাখায়, প্রশাখায়, ফলে, ফুলে, পল্লবে, সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমায় প্রতিভাত।'[৯] এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের নিজের গান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুর প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন কীর্তনের সুর। কীর্তনাঙ্গ গানের ক্ষেত্রে এক দিকে তিনি রক্ষা করেছেন প্রাচীনতার ধারাবাহিকতা অন্য দিকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, আখরযুক্ত ও আখরহীন। আখরযুক্ত কীর্তনের ক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তনের সুরভঙ্গিটি গ্রহণ করে কবি বর্জন করেছেন এর জটিল তাল প্রয়োগপদ্ধতি। কয়েকটি আখরযুক্ত কীর্তনের উদাহরণ দেওয়া হল-

১। আমি জেনেশুনে তুব ভুলে আছি,

২। ওহে জীবনবল্লভ

৩। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।

আখরহীন কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাই বেশী। এর মধ্যে কিছু গান স্পষ্টতই কীর্তন সুর বলে বোঝা যায়। আবার কিছু গানের সুরে কীর্তনের সাথে অন্য সুরের মিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন পর্যায় দু'টি করে কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের উদাহরণ দেওয়া হল-

পূজা

১। আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ

২। আমার না বলা বাণীর

৩। এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার

প্রেম

১। আমার মন মানে না

২। তোমার গোপন কথাটি

প্রকৃতি

১। আমার মল্লিকা বনে

২। তোমরা যা বলো তাই বলো।

পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধের পর একচ্ছত্র ইংরেজ আধিপত্যে, কোলকাতার ইংরেজদের জীবনযাত্রার ঢং পাল্টে গেল। বিলেতি কায়দায় চিত্ত বিনোদনের ইচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয়ে গড়ে উঠল শখের সংগীতের ক্লাব ও থিয়েটারের দল। কোলকাতায় প্রথম বিলেতি আদর্শের থিয়েটার স্থাপিত হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীতের ক্লাব, ইউরোপীয় নৃত্য, -- সামরিক ব্যান্ড (গড়ের বাদ্য) ইত্যাদির চর্চা মোটামুটি এই সময় থেকেই চলতে থাকে। তখনকার দিনে ইউরোপীয়দের অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল ক্লাবে গিয়ে কনসর্ট ও গান শোনা বা থিয়েটারে অভিনয় দেখা। শুধুমাত্র ইংরেজরাই যে কোলকাতায় ইউরোপীয় সংগীতচর্চায় প্রধান ভূমিকা নিতেন তা নয়। জার্মান এবং ইতালীয় অনেক সংগীতজ্ঞেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল কোলকাতার ইউরোপীয়দের সংগীতসমাজে। ১৭৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে হেরাসিম লেবেদেফ নামে রুশদেশীয় একজন ব্যান্ডমাস্টার কোলকাতা এসে দুটি ইংরেজী নাটক বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙ্গালীদের দিয়ে অভিনয় করান। এ কাজে সহযোগিতা করেন গোলকনাথ দাস নামে একজন বাঙালী সংগীতজ্ঞ। এই নাটকের অভিনয় দেখতে বাঙালী সমাজের বহু লোক এসেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে। ক্রমে বাঙ্গালীদের মধ্যেও ইউরোপীয় থিয়েটার অপেরা সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহের সূচনা হয়। তখনকার দিনে ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার বা সংগীতক্লাবে বাঙ্গালীদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায়

বাঙালীয়া "দি চৌরঙ্গী থিয়েটার" নামে একটি অপেশাদার সংস্থা গঠন করলেন। এই সংস্থার অন্যতম পরিচালক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ঠাকুরবাড়িতে পাশ্চাত্যসংগীত চর্চা দ্বারকানাথের সময় থেকেই প্রথম শুরু হয়। দ্বারকানাথে ইউরোপ ভ্রমনকালে তার ১৭ জন অনুচরের মধ্যে একজন জার্মান সংগীতজ্ঞও ছিলেন। পাশ্চাত্য মণীষী ম্যাক্সমুলার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাছে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে তাঁর সংগীতপ্রীতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

"..... তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সংগীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন এবং আমি সে গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম,"[১] ইউরোপীয় সংগীত ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি দ্বারকানাথের আকর্ষণ ছিল গভীর। দ্বারকানাথের বাগানবাড়ি বেলগাছিয়া ভিলায় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝেই ইউরোপীয় নৃত্যগীতের আসর বসত। এই ভিলায় ১৮৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সপারিষদ নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এই দিনের আসরে সংগীত পরিবেশনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন কোলকাতার সেরা ইউরোপীয় গাইয়ে বাজিয়ের দল। ফরাসী অপেরার অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড অকল্যান্ড এবং পরবর্তী কালে মিস এমিলি ইডেনের সম্মানেও দ্বারকানাথ এইরূপ নৃত্যসংগীতের আয়োজন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশ্চাত্যসংগীত প্রীতির কথাও বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায়। প্রথম বয়সে তিনি কিছুদিন সাহেব মাস্টার রেখে পিয়ানো চর্চা করেছিলেন। তাঁর সোৎসাহ সম্মতিতেই ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে বিভিন্ন পাশ্চাত্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাতে পারতেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ দুজনেই হারমোনিয়ম যন্ত্রটি বাজাতে শিখে ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রহ্মসংগীতের সাথে সঙ্গত করতেন। গুরুদেব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন "তিনি গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশী বাজাতে পারতেন" "সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাদেবী উভয়েই

ইউরোপীয় সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে ইন্দিরাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-"ছেলেবেলা থেকেই আমরা গান বাজনার আবহাওয়ায় মানুষ দেশী বিলিতি দু-রকমেরই। ঠাকুর বংশে দেখতে পাই এই দুই ধারাই অল্প বিস্তর চলে আসছে।"[২] রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার আয়োজক, তিনি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের ইউরোপীয় যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছিলেন। "বাল্যকালে প্রতিভা ও আমি একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। সেজদাদা প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি সে আমি জানি।"[৩] প্রতিভাদেবীর ইউরোপীয় সংগীতের চর্চা কতখানি পাকা ছিল সে কথা বলতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "তিনি (প্রতিভাদেবী) পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদি বিলিতি বাজনা। বেটোভনের "Funeral March" ও Moonlight Sonata আমি অন্ত ত হাজারবার শুনেছি।"[৪] ইন্দিরাদেবী বলেছেন- "তাঁর (হেমেন্দ্রনাথ) ঘরে বিলেতি সংগীতের যুগলস্রোত অবিরাম বয়ে চলেছিলো। বড় মেয়ে প্রতিভা দিদিকে তিনি সর্ববিদ্যা পারদর্শিনী করতে চেয়েছিলেন।"[৫] স্বর্ণকুমারী দেবীর (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী) কন্যা সরলা দেবী একজন মেম শিক্ষিকার কাছে রোজ এক ঘণ্টা করে পিয়ানো এবং ইউরোপীয় সংগীত চর্চা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো, বেহালা, হারমোনিয়ম, অর্গান ইত্যাদি যন্ত্রগুলি বাজাতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি পিয়ানোতে দেশী রাগ রাগিণীর গৎকে ইউরোপীয় সংগীতের আদর্শে ফেলে নানা ছন্দে, নানা লয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা করতেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য উক্তি "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যাঞ্জনা প্রকাশ পাইত।"[৬] রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয় চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে সুর তুলতেন আর তাঁরা (রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী তৎক্ষণাৎ কথা বসিয়ে গান বেঁধে ফেলতেন।

পাশ্চাত্য অপেরার অনুকরণে ঠাকুর বাড়িতে গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হত। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্তোৎসব' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানময়ী' অনুরূপ দুটি গীতিনাট্য।

দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যসংগীত ও অভিনয় চর্চ্চার ক্ষেত্রে কোলকাতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংল্যান্ড যান, উদ্দেশ্য ব্যারিস্টারি পড়া, ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার এক বছর পাঁচ মাস ছিলেন। প্রথমে তিনি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরিবার বর্গের সাথে ব্রাইটনে অবস্থান করেন এবং সেখানকার এক পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী কালে উচ্চতর অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে লন্ডনে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লন্ডনে তিনি ডাক্তার স্কট নামে জনৈক ইংরেজ গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থান করেন। ইংল্যান্ডের প্রায় দেড় বছর অবস্থানকালে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি ইউরোপীয় সংগীতও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে চর্চ্চা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

ব্রাইটনে অবস্থান কালে সুদর্শন যুবক রবীন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই শহরে নরনারীদের সাথে পরিচিত হন। সেই সূত্রে প্রায়ই তিনি শহরের বিভিন্ন সংগীত নৃত্য আসরে আমন্ত্রিত হতেন। অল্প দিনেই বিলেতি নাচ তাঁর আয়ত্ত্ব হয়ে গেল এবং বিলেতি গানও শিখলেন বেশ কিছু। কবি ব্রাইটনের সংগীতসন্ধ্যার বিবরণ দিয়েছেন জীবন স্মৃতিতে-

"ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি। মাডাম নীলসন অথবা মাডাম আলবানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই।"[৭]

লন্ডনে যে বাড়িতে উঠেছিলেন যে বাড়িতে গৃহকর্তা ও গৃহকত্রী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী দুই কন্যা ছিলেন। এঁরা দু'জনেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বেশ অনুরক্ত ছিলেন। রোজ সন্ধ্যাতেই এই বাড়িতে গান বাজনার আসর বসত। গৃহকত্রী মিসেস স্কট ও গৃহস্থালীর কাজ সেরে গান বাজনার আসরে যোগ দিতেন। 'জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন "এক একদিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজ গান শিখেছি। জাঁক করতে চাইনা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি Miss A বাজান। Miss A আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন"।

রবীন্দ্রনাথের বিলেতবাসকালীন পাশ্চাত্যসংগীত চর্চা প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী বলেছেন-

"..... সেই সময় বিলেতি সংগীতের সঙ্গে তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) পরিচয় হয় এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোরালো, তার সপ্তকের চড়া গলা, যাকে এদেশে বলে টেনর -শুনে ওরা মুগ্ধ হতো। ..... মনে আছে যে, "Wont you tell me, Molly Darling" "Darling you are growing old" "Good bye Sweet heart, Good by." প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন।"[৮]

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। ব্যারিস্টারি পড়া হল না, কিন্তু কণ্ঠে ও মনে নিয়ে এলেন পাশ্চাত্য সংগীতের গভীর প্রভাব। তারই শিল্পময় প্রকাশ হল *"বাল্মীকি প্রতিভা"*, *"কালমৃগয়া"* ইত্যাদি গীতিনাট্যে, তৎপরবর্তী কিছু গানে এবং সর্বোপরি তাঁর সমগ্র সংগীতচিন্তায়।

দেশে ফেরার কিছুকাল পরেই "দেশী ও বিলতি সুরের চর্চার মধ্যে" বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল" *বাল্মীকি প্রতিভা* গীতিনাট্যে কবি পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষাকে কাজে লাগালেন সার্থকভাবে প্রথমত *বাল্মীকি প্রতিভা* গীতিনাট্যে কবি বিলেতি সুরের অনুকরণে বেশ কিছু গান রচনা করেন। ডাকাতদের মত্ততার গান, 'কালি কালি বলরে আজ (Nancy Lee), দ্বিতীয়টি হল- 'তোরা আয় সবে আয়; আইরিশ সুরে রচিত বনদেবীদের বিলাপের পান- "মরি ও কাহার বাছা" (Go where glory waits the)" ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে পুণরাভিনয়ের সময় রচিত হয়েছিল। 'বাল্মীকি প্রতিভায় কবি পাশ্চাত্য সংগীতের যে আদর্শটি গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে সুরে নাটকীয়তা। সুরকে, সংগীতকে বৈঠকী মর্যাদা থেকে তুলে এনে সংলাপের কাজে, নাটকের কাজে লাগিয়েছিলেন। ভারতীয় সংগীত দুঃখের রাগিণী আছে প্রচুর, এর সুরের ধরনই এমন যে উল্লাস প্রকাশের তেমন সুযোগ নেই। *'বাল্মীকি প্রতিভা'* গীতিনাট্যে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করে (ডাকাতদের মত্ততা ও হাসির গানে) সংগীতকে উল্লাস প্রকাশের কাজে ব্যবহার করলেন।

এ সময় কবি Herbert Spencer এর *"The Origin and Function of Music"* নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে সংগীত বিষয়ে Spencer এর মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং *'সংগীত ও ভাব'* ও *'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'* নামক দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেন। *সংগীত ও ভাব* শীর্ষক বক্তৃতা কবি বেথুন সোসাইটিতে Spencer এর প্রবন্ধ পাঠের আগেই করেছিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর *সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা* প্রবন্ধ লেখেন এবং পরবর্তী সময়ে দুটি প্রবন্ধকেই *সংগীত ও ভাব* নামে যৌথ সংকলন করেন। *সংগীত ও ভাব* প্রবন্ধে কবি বলেছেন-

"আমরা যখন কথা বলি তখন সুরের উচ্চতা নীচতা ও কণ্ঠসুরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতে ভাব প্রকাশ অসম্পুর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চতা নীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়"। এই সময়ে (প্রথম বয়সে) কবি পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংগীতকে ভাব প্রকাশের উৎকর্ষিত রূপ হিসেবেই দেখেছেন। ভারতীয় সংগীতের বিপুলতা গভীরতা ইত্যাদি দ্বারা কবি তখনও তেমন করে আকৃষ্ট হননি। *বাল্মীকি প্রতিভায়* ব্যবহৃত হাসিকান্না, ক্রোধ, বিস্ময় মিশ্রিত নানারূপ কথোপকথনগুলি সুরে বলবার সময় কবি এই ভাব প্রকাশক সংগীতভাবধারার সাহায্য নিয়েছিলেন।

'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গীতিনাট্য *কালমৃগয়া*। *কালমৃগয়াতে* বিলেতি ভাঙ্গা গান ছিল ছয়টি– (১) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে (২) সকলি ফুরালো (৩) মানা না মানিলি (৪) তুই আয়রে কাছে আয় (৫) ও দেখবি রে ভাই (৬) এনেছি মোরা এনেছি মোরা। এ সময় পর্যন্ত গীতিনাটকের জন্য নয় এমন বিলেতি ভাঙা গান পাওয়া যায় না। পরবর্তী চার বছর অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজী ভাঙা বাংলা গান রচনা করেছিলেন মাত্র তিনটি, ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় (১৮৮৪), 'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া' (১৮৮৫) ও 'পুরানো সেই দিনের কথা' (১৮৮৫)।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য *"মায়ার খেলা"*। *মায়ার খেলা* ঠিক *বাল্মীকি প্রতিভা* বা *কালমৃগয়ার* মত সুরে নাটিকা নয়। এতে গানই প্রধান, নাট্যের

ভূমিকা এতে গৌণ। তাই কবি একে বলেছেন "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। এই গীতিনাট্যে একটি মাত্র বিলিতিভাঙা গান দেখা যায়, তা হচ্ছে "আহা আজি এ বসন্তে" এই গানটি *'বাল্মীকি প্রতিভা'*র "মরি ও কাহার বাছা" গানটির অনুকরণে রচিত। বিলেতি ভাঙা বাংলা গান কটিও কবি এ সময়ের মধ্যেই রচনা করেন। *'মায়ার খেলা'* রচনার পর গীতিনাট্য রচনার উৎসাহ যেমন দেখা গেল না তেমনি দেখা গেলনা বিলেতি ভাঙা গান রচনার প্রতি আগ্রহ। কবির শেষ জীবনে লেখা নৃত্যনাট্য বিলেতি সংগীতের কোন প্রভাব তেমন পাওয়া যায়না।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে কবি আবার বিলেত যান। এবার অবশ্য মাত্র একমাসের জন্য। এবারও বিলেতি সংগীত চর্চার মধ্যে কিভাবে তাঁর সময় কেটে যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *"ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী"* থেকে এরপর পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে লেখা তাঁর দু-একটি প্রবন্ধ পাওয়া গেলেও তাঁর বাংলা গানে বিলেতি সংগীতের সুর আর তেমন করে বাজেনি।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ এই ক'বছরেই ইউরোপীয় সংগীতচিন্তার প্রভাবে গীতিনাট্য রচনা এবং তাতে পাশ্চাত্য সুর প্রয়োগের আগ্রহ কবির দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই সময়েই দেখা যায়। গীতিনাট্যের গানগুলি অভিনয়কালে গাইবার যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিলো তা প্রাচীন বা প্রচলিত কোন ভারতীয় গীতিনাট্যের আদর্শ অনুযায়ী নয়। বরং বলা যায় তা ভারতীয় সুর ও ইউরোপীয় সংগীতচিন্তার সমন্বিত প্রভাবের ফল।

মায়ার খেলার পর রবীন্দ্রনাথের গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব আর তেমন দেখা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীতচিন্তায় পরোক্ষভাবে লেগে আছে পাশ্চাত্য সংগীত ভাবনার প্রভাব। পরবর্তী জীবনেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনায় কখনো কখনো লেগেছে পাশ্চাত্য সংগীতের ছোঁয়া যেমন–"আলো আমার আলো ওগো", "হৃদয় আমার যায়", "ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু", "তোমার হল শুরু আমার হল সারা"।

স্বরলিপির প্রতি কঠোর আনুগত্য এবং রবীন্দ্রসংগীতে সুরে অপরিবর্তনীয়তা পাশ্চাত্য সংগীতভাবনারই ফসল।

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।	ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০	৫২
২।	শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ-১৯৯৭	২০
৩।	ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০	৬৬
৪।	শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ-১৯৯৭	২০
৫।	ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০	৭৫
৬।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জীবন স্মৃতি রবীন্দ্র রচনাবলী নবমখন্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কোলকাতা (১৪০২)	৪৮১
৭।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছেলেবেলা রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথমখন্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কোলকাতা (১৪০২)	৮২৮

রবীন্দ্র সংগীতের বিবর্তন, একটি সমীক্ষা

রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে তৎকালীন কোলকাতার সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তথা ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীতচর্চ্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ঠাকুরবাড়িতে সংগীত সাংস্কৃতিক চর্চ্চা এবং এর মাধ্যমে ধর্মবোধ ও দেশাত্মবোধ চর্চ্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসভূমি গড়ে উঠেছিলো ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং বহিরাগত সুধীজনের সান্নিধ্যে। অগ্রজরা সাহিত্য সংগীত চর্চ্চা করছেন, এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছেন, বাড়িতে অধিষ্ঠিত আছেন বহিরাগত গুণী শিল্পীরা। বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রিয়নাথ সেন এই সব কবিদের যাতায়াত ছিল ঠাকুর বাড়িতে। এঁদের সাহিত্যরসে ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ মুখর থাকত। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুর বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতিতে ও বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লিখিত কয়েকটি উক্তি তুলে ধরছি-

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার মধ্যে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

সাহিত্য ও সংগীতের এমনই এক নন্দনকাননে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের শৈশব। পূজা, প্রেম, স্বদেশ প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় দুই সহস্রাধিক গানের বিবর্তনের ধারা আলোচনার জন্য আমরা তাঁর সংগীতজীবনকে বয়সানুক্রমিক তিনটি ভাগে ভাগ করব। ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে প্রথম পর্যায়। ৪০-৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৎপরবর্তী সময়কে তৃতীয় পর্যায় বলে ধরা হবে। অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত গবেষক রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশ সন্ধানে তাঁর সংগীতজীবনকে এই তিনটি কালপর্যায়ে ভাগ করেছেন। যদিও একথা স্বীকর্য যে কোন শিল্পীর সৃষ্টির ধারাকে এই বিভাজন নীতিতে স্পষ্টরূপে বোঝা কঠিন। এই বয়ক্রমিক আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরণের গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব।

পূজা

বিভিন্ন পর্যায়ের গানের মধ্যে আমরা পর্যায়ক্রমে পূজা, প্রেম, স্বদেশ ও প্রকৃতি, মোটামুটি এই চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে *বাল্মীকি প্রতিভা* রচনার পূর্ববর্তী সময়ে রচিত গানগুলি আলোচনায় আমরা কম রাখব। কেননা এই সময়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার চেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। প্রথম পর্যায়ের কিছু পূজার গানের উদাহরণ-

গানের উদাহরণ	-	খ্রীস্টাব্দ
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত	-	১৮৮১
আঁখিজল মুছাইলে জননী	-	১৮৮৪
ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু	-	১৮৮৫
নাথ হে প্রেম পথে সব বাধা	-	১৮৮৭
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	-	১৮৮৮
শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর	-	১৮৯১
অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী	-	১৮৯৩
পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে	-	১৮৯৫
সুধা সাগরতীরে এসেছে নরনারী	-	১৮৯৭
তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি	-	১৮৯০

প্রথম পর্যায়ে লিখিত গান হতে খুব সামান্য অংশ ১০টি গান উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন নীতি অনুসরণ না করে বিক্ষিপ্তভাবে গানগুলি তুলে ধরা হয়েছে। গানগুলির ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, পূজা পর্যায়ের গান রচনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মাচরিত ঈশ্বরবোধের সাথে গভীরভাবে একাত্ম ছিলেন। এ পর্যায়ে শব্দচয়নেও তিনি অনুসরণ করেছেন তাঁর অগ্রজ, তথা পূর্বতন ব্রহ্মসংগীত রচয়িতাদের ধারা। এই সময়ের গানগুলিতে প্রভু, পিতা, জননী, সেবক, মঙ্গলময়, করুণাময়, ব্রহ্ম, প্রেমময়, রাজা, নাথ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। মর্ত্যের মৃত্তিকায় বসে কবি গাইলেন বিশ্বপিতার গান, আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন পরম

করণাময়ের কাছে- "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" তাঁর পতাকা বহন করার শক্তি প্রার্থনা করছেন। ইত্যাদি ভক্তিপ্রণত চিত্তের বিনম্রতা নিটোল শান্তরসে কবির হৃদয় আনন্দায়িত। এ পর্যায়ে কবি ঈশ্বরকে দেখেছেন প্রভুরূপে। পরবর্তী পর্যায়ে এসে কবি ঈশ্বরকে দেখেছেন অনেক বন্ধুভাবাপন্ন রূপে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু গানের উদাহরণ তুলে ধরছি-

		রচনা কাল খ্রীষ্টাব্দ
সকল গর্ব দুর করি দিব	-	১৯০১
নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা	-	১৯০৩
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে	-	১৯০৪
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে	-	১৯০৭
আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে	-	১৯০৯
তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে	-	১৯১০
কে গো অন্তরতর সে	-	১৯১২
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে	-	১৯১৪
আমার সকল দুখের প্রদীপ	-	১৯১৬
রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ বাজে	-	১৯১৮
আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে	-	১৯১৯

এই পর্যায়ে কবির ঈশ্বর অনেক অন্তরঙ্গ। এই পর্যায়ে লৌকিক ধর্মানুসারী এক মুখীনতার পরিবর্তে কবির আধ্যাত্মিক ভাবনায় নানা চিন্তার প্রকাশ। কখনো ভক্ত ভগবানের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল কখনো বা ভগবানও ভক্তের সাথে মিলিত হতে ব্যগ্র- "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।" এই পর্বের কবিভাবনায় কর্মজগত থেকে অবসর নিয়ে পরজগতে লীন হবার প্রবণতা ও লক্ষ্য করা যায়। "সন্ধ্যা হল গো ওমা," "কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়" ইত্যাদি কাব্যসংগীতে তারই আভাস। এই পর্বে কবির অধ্যাত্মচিন্তায় সংশয়,

বেদনা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, বিরহমিলন, মৃত্যুভাবনা সবকিছুই ধরা পড়েছে। ঈশ্বর কেবল আনন্দরূপের প্রকাশকই নন, দুঃখরাতের রাজা হয়েও তিনি দেখা দেন।

এবার তৃতীয় পর্যায়ের পূজার গানের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক-

আমি কান পেতে রই	-	১৯২২
জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে	-	১৯২৪
তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে	-	১৯২৮
ওই শুনি যেন চরণধ্বনিরে	-	১৯৩০
আছ আপন মহিমা লয়ে	-	১৯৩২
গানের ঝরণাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায়	-	১৯৩৬
সমুখে শান্তি পারাবার	-	১৯৩৯

পূজা পর্যায়ের এই পর্বের গানে রবীন্দ্রভাবনায় প্রশান্তির স্নিগ্ধতা। এই পর্যায়ে এসে ঈশ্বর, মানব, প্রকৃতি যেন একই মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। পূজা, প্রেম মিলে গেছে একই অর্থে।

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রথম দিকের গানে কবির ঈশ্বর চেতনায় ব্রাহ্মভাবধারা স্পষ্ট। ভাববিন্যাস ও শব্দচয়নে অনেক ক্ষেত্রেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রাগ্রজদের প্রভাব স্পষ্ট। কবির নিজস্ব কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি স্পষ্ট করে রূপলাভ করেনি। প্রথম পর্যায়ের ভক্তিভাব দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে অনেক অন্তরঙ্গ। কবি এ পর্যায়ে ঈশ্বরকে বহুরূপে দেখেছেন। মানব এবং ঈশ্বরকে একে অপরের পরিপূরকরূপে দেখেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের গানগুলিকে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করা অহেতুক। এই পর্যায়ে এসে কবিচেতনায় সত্য-সুন্দর, প্রেম, কল্যাণ- ইত্যাদির নির্বিরোধ সহাবস্থান ঘটেছে।

প্রেম

আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় প্রেম পর্যায়ের গান। এ পর্যায়ের গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো। ব্যক্তিসত্তার ভাবাবেগের প্রকাশ দিয়ে শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, পরিণতি লাভ করেছে ঈশ্বর মানব ও প্রকৃতি প্রেমের অখণ্ড সত্তায়। এই পর্যায়ের গানগুলিকেও আমরা তিনটি কালানুক্রমিক ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করব।

প্রথম পর্যায়

বলি ও আমার গোলাপবালা	-	১৮৭৮
আজ তোমারে দেখতে এলেম	-	১৮৮১
বলি গো সজনী যেওনা যেওনা	-	১৮৮২
আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে	-	১৮৮৩
মনে রয়ে গেল মনের কথা	-	১৮৮৪
কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া	-	১৮৮৫
কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান	-	১৮৮৬
তবু মনে রেখো, যদি দুরে যাই চলে	-	১৮৮৭
আমার পরান যাহা চায়	-	১৮৮৮
এমন দিনে তারে বলা যায়	-	১৮৮৯
আমার মন মানে না, দিনরজনী	-	১৮৯২
এখনো তারে চোখে দেখিনি	-	১৮৯৩
যদি বারণ করে তবে গাহিব না	-	

প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে দেখা যাচ্ছে একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখ দুঃখ, বিরহমিলন বিষয়ক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। কবির মনের কথা মনেই রয়ে গেল, বসন্তের ক্ষণিক বাতাসের মত প্রাণের পরে কে চলে গেল, কখন বসন্ত চলে গেল, গান গাওয়া হল না, ইত্যাদি ব্যক্তিমনের প্রেমের অপূর্ণতা, অচরিত্যর্থতা, বিরহের

প্রকাশ এ পর্যায়ের প্রেমের গানের উপজীব্য। এ পর্যায়ের বেশীর ভাগ গানেই দেখা যায় অহৈতুক বিষাদময়তার প্রকাশ। এ পর্যায়ের প্রেমসংগীতে প্রেমের পরিণাম-

'তরল কোমল নয়নের জল, নয়নে উঠিবে ভাসি
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি'

দ্বিতীয় পর্যায়

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়সী	-	১৯০২
কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমি জানি মনই জানে-		১৯০৪
বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে	-	১৯০৯
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা	-	১৯১০
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে	-	১৯১১
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে	-	১৯১২
আমি যে আর সইতে পারিনে	-	১৯১৪
কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে	-	১৯১৫
খোল খোল দ্বার রাখিয়ো না আর	-	১৯২০

এই পর্যায়ে কবির প্রেমচেতনা বহিরঙ্গী রূপের আশ্রয় ছেড়ে অনুভূতির দ্যোতক হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। প্রেমকে রূপের বাঁধনে নয়, ভালবাসার বাঁধনে বাঁধতে চান, গানের সুরে খুলতে চান হৃদয়ের দুয়ার। প্রেমের অচরিতার্থতা, বিরহের দুঃখ নয়, এ পর্যায়ে বিরহ মধুর রূপে প্রকাশিত হল কবির কাছে। প্রেম এ পর্যায়ে "স্বপ্নমদির নেশায় মেশা" উন্মত্ততা মাত্র নয়। শুধু সঙ্গ সুখের নির্মল আনন্দ অনুভবে তৃপ্ত কবি। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাণের খেলার লীলায় কবি মগ্ন।

তৃতীয় পর্যায়

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল	-	১৯২২
নাইবা এলে যদি সময় নাই	-	১৯২৩
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে	-	১৯২৪
আনমনা আনমনা	-	১৯২৫
ওগো জলের রাণী	-	১৯২৬
জ্বলেনি আলো অন্ধকারে	-	১৯২৭
যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে	-	১৯২৮
মন যে বলে চিনি চিনি	-	১৯২৯
এবার বুঝি ভোলার বেলা হল	-	১৯৩০
সখী আঁধারে একেলা ঘরে	-	১৯৩১
আমি যখন ছিলেম অন্ধ	-	১৯৩২
তোমায় সাজাব যতনে	-	১৯৩৩
বারতা পেয়েছি মনে মনে	-	১৯৩৪
কী বেদনা সে কি জানো ওগো মিতা	-	১৯৩৫
এখনো কেন সময় নাহি হল	-	১৯৩৬
আজি গোধুলি লগনে এই বাদলগগণে	-	১৯৩৭
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	-	১৯৩৮
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে	-	১৯৩৯
প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে	-	১৯৪০
আমি যে গান গাই, জানিনে সে কার উদ্দেশ্যে	-	১৯৪০

প্রেমের সুখময় প্রশান্তিই এ পর্যায়ে মুখ্য এ প্রেম মিলনের কি বিরহের, মনে রাখার কি ভুলে যাবার কোনটাই মুখ্য নয়। এই সময়ের প্রেমের গানে বিস্মৃতির দাহ নেই, বিরহের অতৃপ্তি নেই, শুধু অনুভবের প্রশান্তি, কবি জানেন ফুলডোরে বাঁধা দুজনার প্রেম চিরকালের।

চিরজীবনের স্বপ্নসঙ্গিনীকে চিনতে না পারার আকুলতা এখানে তীব্র, কিন্তু এই তীব্রতা বেদনাময় নয়। ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম একই পথে চলেছে এই পর্যায়ের প্রেম সংগীতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলির কাব্যাংশ বিশ্লেষণ করলে কালানুক্রমিক বিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

প্রাথমিক পর্বের প্রেমচেতনায় দেখা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, রোমান্টিক বিষাদময়তা। বিরহের আভাস, প্রেমের অচরিতার্থতার বেদনা ফুটে ওঠে গানগুলিতে। দ্বিতীয় পর্বের প্রেমচেতনা সুখ দুঃখ অতিক্রান্ত, মিলনবিরহানন্দে উদ্ভাসিত। মিলনের মতো বিরহকেও প্রেমের স্বরূপ হিসেবে সম্ভোগ করেছেন কবি এ পর্যায়ের গানে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে কবির প্রেমচেতনা স্থিত বৈশিষ্ট্যে উপনীত। পরিণত বয়সের পূজার গানে যেমন অনুভূতির গভীরতায় সীমা-অসীম, ঈশ্বর-মানব সব কিছু একাকার, প্রেমের গানগুলিতেও সেই একই অনুভূতির প্রকাশ। শেষ বয়সের প্রেমের গানে যেমন মানব, ঈশ্বর এবং প্রকৃতি সমার্থক অনুভবে উজ্জ্বল, তেমনি দুঃখ-সুখ, বিরহ মিলন এক শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দের গভীরে স্থিত। প্রকৃতিতে অনুভব করেছেন প্রিয়ার ছায়া, প্রিয়া এবং প্রকৃতি হয়ে উঠেছে অভিন্ন, সীমা হারিয়েছে গণ্ডীর বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান আত্মবোধের গান। প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর কবির আন্তরিক অনুভূতিতে একীভূত, ব্যক্তিসত্তার বন্ধনমুক্ত পুলকে তাঁর প্রেমের গান সর্বপ্রকার অনুভূতি পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে শেষ বয়সে।

ব্যক্তিসত্তার ভাবাবেগের প্রকাশ দিয়ে শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি প্রেমের অখণ্ড সত্তায়।

স্বদেশ

রবীন্দ্রনাথ দুটি বিষয় পারিবারিক সূত্রে জন্মলগ্ন থেকেই পেয়েছিলেন একটি ব্রহ্মসংগীত দ্বিতীয়টি স্বাদেশিকতা। হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক চর্চ্চা শৈশব কাল থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশভাবনার উন্মেষ থেকে

উদ্ভূত হিন্দুমেলার প্রবর্তনের সময় (১৮৬৭ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর। হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ্য করে লিখিত হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীত', সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' তখন সবার মুখে মুখে ফিরছে। এই সব স্বদেশী গান, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট স্বদেশচেতনা বালক রবীন্দ্রনাথকেও স্বদেশী সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করলো। রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বদেশী সংগীত রচনা করেন সঞ্জীবনী সভার জন্য, ষোল বছর বয়সে 'তোমারি তরে মা স'পিনু এ দেহ' (জয়জয়ন্তী, চৌতাল)। এই সময়ের গানগুলিতে তরুণ কবির দেশমাতৃকার জন্য ভক্তিভাব, পরাধীনতার জন্য গ্লানি, বিষাদবোধ এবং সর্বোপরি আত্মজাগরণের জন্য বলিষ্ঠ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্বে রচিত কিছু স্বদেশী সংগীতের উদাহরণ দেয়া হল–

		(রচনাল কাল (খ্রীঃ)
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ	-	১৮৭৭
ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি	-	১৮৭৮
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন	-	১৮৭৯
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে	-	১৮৮১
একী অন্ধকার ভারতভূমি	-	১৮৮৫
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক	-	১৮৮৫
কেন চেয়ে আছো গো মা	-	১৮৮৬
তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	-	১৮৮৭

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এক গুচ্ছ স্বদেশগৌরবী গান রচনা করেন। এই সময়ের গানগুলিতে বাণী, ভাব ও সুরের সমন্বয়ে স্বকীয়তায় উত্তরণের আভাস স্পষ্ট।

	রচনাকাল (খ্রীঃ)
অয়ি ভুবনমনমোহিনী মা	১৮৯৬
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	১৮৯৮
আজি এ ভারত লজ্জিত হে	১৯০০
এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু	১৯০৩

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। সাময়িক পটভূমিতে রচিত হলেও এ গানগুলি সাময়িকতার আবেদন ছাড়িয়ে সর্বকালে এর ব্যাপ্তি বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে বাঙালীর আন্দোলন তখন তুঙ্গে। প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথেরও তখন গগনচুম্বী রূপ। লেখায়, ভাষণে, সংগীতে তিনি তাঁর স্বাদেশিক মনোভাব প্রকাশ করছেন। দেশের সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে লোকায়ত বাউল, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালীর সুরকে অবলম্বন করলো এ পর্যায়ের স্বদেশী সংগীত। শুধুমাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৯০৫ সালেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন প্রায় বিশটি স্বদেশী গান।

১৯০৫

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
ও আমার দেশের মাটি

এই সময়ে রচিত গানগুলির মধ্যে দু-একটি ছাড়া প্রায় সবই বাউল সুরে রচিত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেমন স্বদেশী সংগীতের জোয়ার এসেছিলো রবীন্দ্র রচনায়, তেমনি এই সময়ের পর থেকেই মন্থর হয়ে গেলো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসংগীত রচনা ধারা। কবির স্বদেশচেতনা, বিশ্বমানবচেতনা ও উদার ধর্মচেতনার সাথে একই ধারায় মিলে গেল। স্বদেশী যুগে কবি বলেছিলেন- "স্বদেশের মধ্যে ভগবানের একটি বিশেষ আবির্ভাব উপলব্ধি করা ও স্বদেশের হিত সাধক ভগবানের সেবার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া গণ্য করাকে

যদি আমরা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে থাকি, তবে সেই ধর্ম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচার করিবার স্বদেশী উপায়কে আমরা যেন উপেক্ষা না করি।"[১] (ভাণ্ডারী/আশ্বিন ১৩১২)। আটচল্লিশ বছর হতে শেষ জীবন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে মাত্র ১৫/১৬টি স্বদেশী সংগীত পাওয়া যায়। এই সময়ে লেখা কয়েকটি স্বদেশী সংগীতের উদাহরণ দেয়া হল-

	রচনাকাল
রইল বলে রাখলে কারে	১৯০৯
হে মোর চিত্ত পূণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে	১৯১০
জনগণমন অধিনায়ক জয় হে	১৯১১
মাতৃমন্দির পূণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল	১৯১৭
সাধন কি মোর আসন নেবে	১৯২২
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়	১৯২৬
সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	১৯২৯
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো	১৯৩৩
শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান	১৯৩৭
ওরে নতুন যুগের ভোরে	১৯৩৭

সংখ্যার বিচারে দুই সহস্রাধিক কাব্যসংগীতের মধ্যে পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের গানের তুলনায় স্বদেশী সংগীত অনেক কম। তবে সমকালীন গণপ্রচার ও গণতাৎপর্য ছাড়াও সর্বকালীন রসবিচারে এসব গানের ভাষা ও সুরের স্বকীয়তা অনুধাবনযোগ্য। প্রথম পর্বে রাগসংগীতের সুরে রচিত ব্রহ্মসংগীত রচনার অভ্যাসে স্বদেশী সংগীতেও রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাগ রাগিণী বসিয়েছেন। জয়জয়ন্তী, বাহার, গৌড় মল্লার, দেশ, খাম্বাজ, বেহাগ, সিন্ধু, হাম্বীর, ইত্যাদি রাগের প্রয়োগ দেখা যায় এই সময়ের স্বদেশী সংগীতে। দু-একটি গান ভাঙ্গা সুরেও রচিত। গুজরাটি ভজনের সুরে সৃষ্টি করেছেন একী অন্ধকার ভারতভূমি, একটি হিন্দুস্তানী গান ভেঙ্গে করেছেন এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ' (য়ে মেরে চিত নিশিদিন, সরট/চৌতাল)। ২৪-২৫ বছর বয়সের দুটি গানে আবার দেখা যায় বাউল ও রামপ্রসাদী সুরের

প্রভাব। বঙ্গভঙ্গের যুগের সুরের আশ্রয় ছিল বাংলার পল্লীসংগীত। এই সময়ের গানগুলির সুর করেন লোকসংগীতকে আশ্রয় করে।

সাময়িক উপলক্ষ্যে রচিত হয়েও রসবিচারে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সাময়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো না। উপলক্ষ্য যাই হোক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্বকালের সর্বলোকের।

প্রকৃতি

গীতবিতানে প্রকৃতি পর্যায়ে গানগুলিকে সাতটি উপপর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সাধারণ উপপর্যায়ে আছে নয়টি গান, গ্রীষ্মে ১৬টি, বর্ষার গানের সংখ্যা সর্বাধিক ১১৬টি, শরতে ৩০টি, হেমন্তে ৫টি, শীতে ৫টি, এবং বসন্তে ৯৬টি গান। সাধারণ উপপর্যায়ের গানগুলিতে প্রকৃতির লীলা বর্ণিত হয়েছে। কিছু গানে কবি নিখিল বিশ্বের সাথে অনুভব করেছেন আপন অস্তিত্বের সম্পর্ক, অন্যান্য গান গুলিকে বলা যেতে পারে ঋতুসংগীত।

শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসনে বন্দী কবি প্রতিক্ষণে অনুভব করেছেন মুক্ত প্রকৃতির উদার আকর্ষণ। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ইত্যাদি গ্রন্থে কবির কৈশোরক প্রকৃতিময়তার বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে জমিদারীসূত্রে পূর্ববঙ্গ, তারপর শান্তিনিকেতন বাস কবির প্রকৃতিভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান, বিশেষ করে ঋতু সংগীতের যথার্থ প্রকাশ দেখা যায় কবির শান্তিনিকেতন বাস অর্থাৎ চল্লিশ এর দশকের পরে কবির সংগীত রচনারম্ভ থেকে শুরু করে তাঁর শান্তিনিকেতন বাসের পূর্ব পর্যন্ত ঋতু সংগীতের সংখ্যা খুবই কম। বর্ষার সাতটি, বসন্তের তিনটি, শরতের তিনটি আর উপরোক্ত তিনটি ঋতুর বর্ণনাময় "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে" গানটি অপর তিনটি ঋতুর গান কবিভাবনায় তখনো গুরুত্বের আসন পায়নি। প্রথম জীবনে প্রকৃতির গানে দেখা যায় নিসর্গরূপ বিবৃত হয়েছে অনুপুঙ্খভাবে কিন্তু তেমন করে আন্তরিক যোগসাধন হয়নি। ষোল বছরে লেখা একটি গান "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা", গানটিতে রাধার অভিসারযাত্রাপথের বিপদসংকুলতার অনুসঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে দুর্যোগপূর্ণ বর্ষা রাতের

রূপ। মানবচিত্তের অন্তঃপ্রকৃতির সাথে বাইরের বর্ষারাত্রির কোন যোগ এখানে প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতিকে যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে বহিরঙ্গরূপেই দেখেছেন কবি প্রথম বয়সে।

ত্রিশ বছর বয়সে কবি যখন পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের জমিদারী তদারকীর ভার নিয়ে দীর্ঘদিন ঐ অঞ্চলে বাস করতে লাগলেন, তখনই প্রথম প্রকৃতিকে ভাল করে চিনবার অবসর হল কবির। দীর্ঘকাল (প্রায় দশ, বারো বছর) সেখানকার প্রকৃতি, সেখানকার আকাশ, বাতাস, শস্যপূর্ণ প্রান্তর, ইত্যাদির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে, এই প্রকৃতি ও কবির মনের যেন একটি আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হল। চল্লিশ বছর বয়সে কবি পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করলেন। পূর্ববঙ্গের পল্লী প্রকৃতির সাথে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে পার্থক্য অনেক। পূর্ববঙ্গের মতো সরস, শস্যশ্যামল নয় এ অঞ্চল। শীত, গ্রীষ্ম উভয় ঋতুরই তীব্রতা এখানে বেশী। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি ঋতুকে যেন স্পষ্ট করে অনুভব করা যায়। প্রথম যুগের শান্তিনিকেতনের প্রায় নির্জন এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কবির সাথে প্রকৃতির আন্ত রিক যোগসাধনার পথ যেন সহজ হল। পরবর্তী চল্লিশ বছরে কবি ঋতুসংগীত লিখলেন অনেক। ঋতুসংগীতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত বর্ষা, শরৎ, বসন্তেরই বেশী প্রাধান্য দেখা যায়।

ঋতুর গানের ক্ষেত্রে শেষ দুই দশকের গানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ বছর ব্যাপী (চল্লিশ থেকে ষাট) শান্তিনিকেতনে ঋতুবৈচিত্র্য উপভোগের সার্থক পরিণতি দেখা গেল এই সময়ে। গ্রীষ্ম ও হেমন্ত, এই দুই ঋতু এর আগে কবির ঋতু সংগীত রচনায় প্রাধান্য পায়নি। এবার তারা প্রাধান্য পেল। শীতের গানও এর আগে কবি মাত্র দুটি রচনা করেছিলেন তিপ্পান্ন বছর বয়সে। এই সময়ে ছয়টি ঋতুই প্রাধান্য লাভ করল তাঁর লেখনীতে। শেষ বিশ বছরের প্রকৃতির গান বাণীর চিত্রকল্পে, সুরযোজনার সারল্যে, এমনকি সংখ্যার বিচারেও আগের গানের তুলনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নীচে তিনটি কাল পর্যায়ের লিখিত ঋতুসংগীত গুলির ঋতু ভেদে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

প্রথম পর্যায়

		রচনাকাল (খ্রিঃ)
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা সতিমির রজনী সচকিত সজনী	বর্ষা, ভানুসিংহের পদাবলী	১৮৭৭
সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া	- বর্ষা	১৮৮২
এমন দিনে তারে বলা যায়	- বর্ষা, প্রেম	১৮৮৯
ঝর ঝর বরিষে বারিধারা	- বর্ষা,	১৮৯৫
ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে	- বর্ষা	১৮৯৭
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে	- বর্ষা	১৯০০
আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে	- শরৎ	১৮৮৬
বাজিল কাহার বীণা	- শরৎ	১৮৯৪
তুই রে বসন্ত সমীরণ	- বসন্ত	১৮৮১
এসো এসো বসন্ত ধরাতলে	- বসন্ত	১৮৮৮

দ্বিতীয় পর্যায়

		রচনাকাল (খ্রিঃ)
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একী দুর্দিন	- বর্ষা	১৯০৮
মেঘের পরে মেঘ জমেছে	- বর্ষা	১৯০৯
নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি	- বর্ষা	১৯১০
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে	- বর্ষা	১৯১৪
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ	- শরৎ	
আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি	- শরৎ	১৯০৮
মম অন্তর উদাসে	- বসন্ত	১৯১২

তৃতীয় পর্যায়

		রচনাকাল (খ্রিঃ)
দারুণ অগ্নিবাণেরে	- গ্রীষ্ম	১৯২২
হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর	- গ্রীষ্ম	১৯২২
নাই রস নাই	- গ্রীষ্ম	১৯২৫
মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী	- গ্রীষ্ম	১৯২৬
আষাঢ় কোথা হতে পেলি ছাড়া	-বর্ষা	১৯২৫
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে	-বর্ষা	১৯২৫
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে	-বর্ষা	১৯২৯
আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ	-বর্ষা	১৯৩৭
আমার প্রিয়ার ছায়া	-বর্ষা	১৯৩৮
আমি কী গান গাব যে	-বর্ষা	১৯৩৯
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে	-বর্ষা	১৯৩৯

রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁর প্রেমভাবনা, প্রকৃতিচেতনা, অধ্যাত্মচিন্তা, স্বদেশ ভাবনা পরিণামে এসে এক অখণ্ড আনন্দ রসে রূপ লাভ করেছে। যতই শেষের দিকে গেছে ততই পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ইত্যাদির মধ্যে ভাবগত কোন সীমারেখা টানা যেন কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিণত বয়সের প্রেমের উপলক্ষ্য মানব, প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর নয়, প্রেমের অনুভূতিই সেখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশাত্মবোধক গানেও কবি বিশ্বানুভূতিতে ব্যাপ্ত।

সুরের প্রসঙ্গে বলতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোযন্ত্রে 'অঙ্গুলিনৃত্য' এবং ঠাকুরবাড়িতে আশ্রিত ওস্তাদের গীত হিন্দী ধ্রুপদসংগীতের সুরকে আশ্রয় করে সুরকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যের গানগুলি বিদেশী সুরের প্যাটার্নে যাত্রা বা অপেরার ঢং এ রচিত।

সম্মুখেতে বহিছে তটিনী
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
না সজনী না।

১৮৮১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়ে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের দিকে তাকালে দেখা যায় মৌলিক গানের তুলনায় ভাঙা গানের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। যদিও এই পর্যায়ের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। যদিও এই পর্যায়ের শেষের দিকে ভাঙা গানের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। মৌলিক গানের ক্ষেত্রেও এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ সুরপ্রয়োগে কোন না কোন রূপকে আশ্রয় করেছেন। অর্থাৎ সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ সময় সংগ্রাহকের ভূমিকাই তাঁর বেশী। সুরতো বটেই এই সময়ের কোন কোন গানের রবীন্দ্রনাথ মূল গানের ধ্বণীব্যঞ্জনাও অনুকরণ করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মূলগান	ভাঙ্গাগান
আজি বহত সুগন্ধ	আজি বহিছে বসন্ত
মোহন মদ খাও	নূতন প্রাণ দাও
তুয়া চরণ কমল পর	তব অমল পরশরস

এখানে প্রথম ছত্রের উদাহরণ দেয়া হল। বেশ কিছু গানে এই ধ্বণীবিন্যাস ঐক্য গানের মাঝখানেও দেখা যায়। 'তুয়া চরণ কমল পর' গানটির মাঝখানে আছে 'জ্ঞান ধ্যান তুআ ভক্তি চাহত হই" কবির হাতে এটি দাঁড়াল 'জ্ঞানধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব'। শেষাংশে উল্লিখিত আছে "শ্রী আনন্দ কিশোর" (রচয়িতার নাম) কবি লিখলেন 'শ্রী আনন্দ জাগাও।'

সুর রচনার এই প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ সুরকার হিসেবে তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে পারেননি। চলেছে গ্রহণ-বর্জন, পরীক্ষা নীরীক্ষার পালা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ তখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত (বিশেষ করে এই পর্যায়ের শেষ দিকে)। কাব্যবোধ, সাহিত্যদর্শন তখন মৌলিকতার স্তরে উন্নীত। বিশ্বাত্মবোধ, রোমান্টিকতা, অসীমের আহ্বান, ইত্যাদি বিশিষ্ট

কাব্যানুভূতি তখন কবির মনে শিল্পসৌন্দর্যে অভিষিক্ত। কিন্তু তার আধারিত সুর তখনো স্ববৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত নয়। এই কাব্যানুভূতি সুরে প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি আশ্রয় করলেন প্রাচীন ভারতীয় রাগ রাগিণীকে। বলা বাহুল্য ইমন, পূরবী, কানাড়া ইত্যাদি সুরের তাগিদে কবি গান রচনা করতে বসেননি। বরং বলা যায় কবির কাব্যচেতনাকে সুরাবয়ব দান করলেন ইমন, পূরবী, কানাড়ার অবলম্বনে। অর্থাৎ কবি এদের সাংগীতিক শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি বরং কথার প্রয়োজনে "যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিম্বা মন্দ শুনায় না। আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে"[১] তবে কবি তাই করেছেন। প্রথম বয়সে রাগসংগীতের জগতে বিচরণকালেও কবির অন্তরে বিভিন্ন রাগ রাগিণী যাতায়াতে একটি স্বকীয় সুরের কাঠামো গড়ে উঠেছিলো এবং প্রথম পর্বের প্রথম দিকেই তাঁর নিজস্ব সাংগীতিক কাঠামোর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। রাগ এর শুদ্ধতা রক্ষা করেও রাবীন্দ্রিক সুর ঢং এ রচিত কিছু গানের উদাহরণ দেওয়া হল-

	বয়স
মনে রয়ে গেল মনের কথা (বেহাগ)	২২
বুঝি বেলা বহে যায় (ভীমপলশ্রী)	২২
যদি বারণ কর তবে (ছায়ানট)	৩৬
কে দিল আবার আঘাত (কেদারা)	৩৬
যদি এ আমার (কাফি)	৩৯

এই গান গুলিতে রাগ রাগিণীর স্পষ্ট প্রকাশ থাকলেও রসজ্ঞ শ্রোতার কানে এগুলোর স্বতন্ত্র রাবীন্দ্রীক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। (২৩ বছর বয়সে লেখা 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত' গানটির সাথে তুলনীয়)।

II	মা	মা	।	মপা	-দণা	দপা	।	মা	জ্ঞা	।	রা	ম্জ্ঞা	-া	I
	ম	হা		সিo	oঙ্	হাo		স	নে		ব	সি	o	
													II	
I	ঋা	সা	।	সঋা	-জ্ঞমা	মা	।	জ্ঞা	ঋা	।	ঋা	সা	-া	I
	ও	নি		ছo	oo	হে		বি	শ্ব		পি	ত	o	
I	ণ্া	সা	।	জ্ঞা	-া	মা	।	পা	দা	।	ণা	-দণর্সা	র্সা	I
	তো	মা		রি	o	র		চি	ত		ছ	oo ন্	দে	
I	পা	পদা	।	-ণা	-া	দপা	।	মপমা	জ্ঞা	।	জ্ঞা	-ঋসা	ঋা	II
	ম	হা o		o	ন্	বিo		শ্বেoo	র		গী	oo	ত	

দ্বিতীয় পর্বে এসে (১৯০১-১৯২১) ভাঙা গানের সংখ্যা অনেক কমেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জন উদ্দীপিত স্বদেশী সংগীত ছাড়া এই সময়ে ভাঙা গান তেমন একটা দেখা যায় না। স্বদেশী যুগের এই গানগুলি ছাড়া এই সময় রবীন্দ্রনাথের সুর প্রয়োগ হিন্দুস্তানী রূপকে আশ্রয় করেই হয়েছে। কিন্তু দেখা দিয়েছে স্বকীয়তার স্পষ্ট রূপ। রাগরাগিণীর স্পষ্টতা সত্ত্বেও কবি মনের ভাব প্রকাশে প্রায়শই ব্যাকরণচ্যুত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ভৈরবীর স্বর সমন্বয়ে যখন জয়ী প্রাণের আনন্দটি বোঝানো গেল না তখন এই কাব্যরূপ প্রকাশে ভৈববীর উপর একান্ত নির্ভরতা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তাই করলেন যাতে "ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়" এবং "শুনতে মন্দ শোনায় না" ভৈরবীর কোমল ঋ'র স্থলে কবি প্রয়োগ করলেন শুদ্ধ 'র'। ওস্তাদের বিচারে হয়তো সুরভ্রষ্ট হলেন, কিন্তু কাব্যের নান্দনিক, যথার্থ প্রকাশে স্রষ্টা ও শ্রোতার মন আনন্দিত হল। সুর প্রয়োগে রাগরূপের মাঝে প্রযুক্ত হল রবীন্দ্রস্বকীয়তা, এই সময়ের কিছু গানের উদাহরণ দেয়া হল।

	বয়স	রচনা কাল
মনমোহন গহন যামিনী শেষে (আশাবরী)	৪১	১৯০৩
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে (পরজ)	৪১	১৯০৩
দাঁড়াও আমার আখির আগে (বেহাগ)	৪৩	১৯০৪
যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ (কাদি)	৪৩	১৯০৪

(১৯০২-১৯৪১) তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ শেষ পর্বে এসে গ্রহণ বর্জনের পালা শেষ করে রবীন্দ্রসংগীত স্বকীয়ত্বের পর্যায়ে উপনীত। বাল্যকাল থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুর বাড়ি আচরিত মান সংগীত, শিলাইদহে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালীর সুর অন্তরে ধারণ করে যে শিল্পী সত্তা গড়ে উঠল তারই সরল সমীকরণ দেখা গেল এ পর্যায়ে। বর্ষার গানে একই সঙ্গে বসিয়েছেন বর্ষার মল্লার ও রাত্রির কানাড়াকে, ভীমপলশ্রী মূলতান, টোড়ি মিশেছে একই গানে, বাউল, কীর্তন হিন্দুস্তানী সংগীতে মাখামাখি হয়েছে তাঁর গানে।

ঠাকুর বাড়ি চর্চিত রাগসংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, ভাঙা গানকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। দীর্ঘ জীবনের গ্রহণ বর্জন, পরীক্ষা নীরীক্ষার পালা পেরিয়ে যত শেষের দিকে গেছেন ততই তাতে যুক্ত হয়েছে কথা ও সুরের পরিপূরকতায় একটি নিজস্ব ঢং। যা একান্তই রাবীন্দ্রিক, যার তুলনা শুধুই রবীন্দ্রসংগীত।

পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার ক্রমবিকাশ

আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনায় ভাববাদ এবং রূপবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা। এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন হতে রবীন্দ্রসমসাময়িক কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংগীত চিন্তার ধারাবাহিকতা এবং পাশ্চাত্য সংগীত চিন্তায় ভাববাদ, আবেগবাদ এবং রূপবাদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রীসে। শিল্পের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সংগীত এই আলোচনার একটি বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী গ্রীক দার্শনিক পীথাযোগরাসই এই সংগীতচিন্তার পথিকৃৎ। যদিও পীথাগোরীয় দর্শনে সংগীত প্রসঙ্গ খুব সামান্যই এসেছে। পীথাগোরাস সংগীতকে মহাজাগতিক সংখ্যাতত্ত্বের সাথে তুলনা করেছেন ("Pythagoras who explained music as the expression of that universal harmony which is also realized in arithmetic and astronomy."[১] "He contributes to the science and music by working out by maths."[২]

পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় পীথাগোরাসের পরেই প্লেটোর স্থান। প্লেটোর দর্শন পীথাগোরাসের দর্শন থেকে সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত না হলেও সংগীতে প্লেটো ছিলেন মৌলিক চিন্তার প্রবক্তা। প্লেটো সংগীতকে মহাজাগতিক উপলব্ধি বা সংখ্যাতত্ত্বের সাথে তুলনা করে কোন রহস্যের ধূম্রজালে আবদ্ধ করেননি। প্লেটো সঙ্গীতকে বাস্তব জীবন এবং মানুষের আন্তরিক চিন্তার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করেছেন। বস্তুত প্লেটোর সময় থেকেই পাশ্চাত্য সংগীত চিন্তা একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করে। অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সংগীতের সৌন্দর্য চিন্তা" গ্রন্থ থেকে প্লেটোর সংগীতচিন্তা বিষয়ক কিছু উক্তি তুলে ধরছি "প্লেটো বলেছেন, ছন্দ ও হারমনির এমনই শক্তি যে আত্মার গহন স্তরকে স্পর্শ করে, সুতরাং সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অতীব।" "সংগীতের প্রকৃত শিক্ষা যিনি লাভ করেছেন তাঁর চোখে অন্যান্য শিল্পকলার দোষ ত্রুটি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যহীন রূপগুলি খুব সহজেই চোখে পড়ে, বিষয়গুলি তাকে পীড়া দেয়,

কিন্তু যা সুন্দর তা তাঁর তারিফ আদায় করবেই এবং তাঁকে আনন্দ দেবে এবং সে আনন্দ আত্মিক, ফলে তিনি হয়ে ওঠেন সৎ ও সম্ভ্রান্ত।" " প্লেটোর মতে সুন্দর সংগীত সৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্রের অনুসারী, আবার বিপরীতভাবে যে হারমনি সৌন্দর্যহীন, যে ছন্দ বিসম ও বিসদৃশ তা রুচিহীন শব্দ ও অসৎস্বভাবকেই মনে করিয়ে দেয়। প্লেটো আরো বললেন "সহজ সরল সংগীত সুষম আত্মার বিকাশ সাধনে ফলপ্রসূ।"[৩]

প্লেটো ছিলেন নীতিপরায়ণ। সংগীত সম্বন্ধে প্লেটোর সাবধানবাণী ছিল এই যে, "যে সংগীত রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিকে বদলে দেয়, সে সংগীত রাষ্ট্রে বিপজ্জনক ও বর্জনীয়।" প্লেটোর এই নীতিবাক্য শুধু সংগীত সম্বন্ধেই উচ্চারিত হয়নি। সাধারণভাবে শিল্পকলা সম্পর্কে প্লেটোর এই নীতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে "কবিতাটি সুন্দর এইটিই এর একমাত্র ধর্ম হতে পারে না তার নৈতিক মূল্য কি? নৈতিক গুণ সম্পন্ন না হলে সে কবিতা নিষিদ্ধ প্লেটোর মনোভাব ছিল এই।"[৪]

শিল্পতত্ত্বের প্রথম স্বীকৃত মতবাদ হচ্ছে অনুকৃতিবাদ। অনুকৃতিবাদের প্রবক্তা ছিলেন পীথাগোরাসের শিষ্য প্লেটো এবং তদীয় শিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল এর মতে শিল্প হচ্ছে অনুকরণাত্মিক ক্রিয়ার ফল। চিত্র, ভাস্কর্য, কাব্য, সংগীত, নৃত্য যে কোন শিল্পই তাঁদের মতে অনুকৃতি এবং শিল্পের সাফল্য এবং উৎকর্ষতা নির্ভর করে শিল্পকর্মের সাথে মূল বস্তুটির সাদৃশ্যগত মাত্রার উপর। শিল্পে অনুকরণবাদ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল, অনুকরণবৃত্তি মানুষের সহজাত ধর্ম। এই সহজাত ধর্মের সাথে আরেক সহজাত ধর্ম অর্থাৎ সৃষ্টি আকাঙ্খার তাগিদে (সংগীতের ক্ষেত্রে Instinct of harmony and rhythm) শিল্পসৃষ্টি হয়। প্রত্যেক শিল্পের একটি নির্দিষ্ট মাধ্যম আছে, বিষয়বস্তুর তারতম্য ভেদে মাধ্যমের তারতম্য হয়। যেমন সংগীত সুরের মাধ্যমে অনুকরণ করে, এক্ষেত্রে সুরের মাধ্যমে যে বস্তুকে অথবা ভাববস্তুকে অনুকরণ করা যায় সংগীত তাই অনুকরণ করবে এবং এই নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে উপস্থাপিত বস্তুর অনুকরণের সাফল্যের উপর শিল্পের সাফল্য নির্ভরশীল। অনুকৃতিবাদে একদিকে রয়েছেন অনুকার্য বিষয়বস্তু অন্যদিকে অনুকর্তা অর্থাৎ শিল্পী। শিল্পীর কাজ হচ্ছে জগতকে স্বরূপে জানা এবং তাঁর অনুরূপ শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সকলকে জানানো। অনুকৃতিবাদের

দৃষ্টিতে শিল্পী যা কিছু সৃষ্টি করেন তা জগতের প্রতিরূপ না হোক, অনুরূপ হবেই। সংগীতের ক্ষেত্রে বলা যায় সুর এবং ছন্দের মাধ্যমে শিল্পী অন্তর্গত ভাবাবেগকে অনুকরণ করেন। সংকেতবিহীন সুর, ছন্দ মনের ভাবাবেগের গতি ছাড়া আর কিছুই বর্ণনা করতে পারে না।

অ্যারিস্টট্‌লের শিষ্য অ্যারিস্টকসেনাস সংগীত সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ করেন তা মৌলিক এবং অভূতপূর্ব। পীথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্বের সাথে সংগীতের সম্পর্ক বিষয় মতবাদের সমালোচনা করে অ্যারিস্টকসেনাস বলেন যে, সংখ্যাতত্ত্বের স্বরৈক্য সূচক যে অনুপাতের কথা বলা হয়েছে তার সাথে সংগীতের কোন সম্পর্ক নেই, সংগীত শ্রবণেন্দ্রিয় বিষয় এবং এর উপাদান হল শ্রবণযোগ্য স্বর।

খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দী থেকে শুরু করে ৭০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে এসে সেভাইলের সেন্ট ইসিডর অত্যন্ত সহজ ব্যাখ্যা দেন। সংগীতের আবেগপ্রবণতাকে মৌলিক বিষয় ধরে নিয়ে ইসিডর বলেন– "সংগীত হৃদয়কে অভিভুত করে (Music moves affection)।"[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ 'আবেগবাদ' (Doctrine of affection) এর সূচনা হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতেই। দুই শতাব্দী পরে হ্রাবানুস মাউরুসও প্রায় একই কথা বললেন। সংগীতকে জীববিজ্ঞানের হেতুরূপে বর্ণনা করে হ্রাবানুস বললেন, "যে সংগীত ভাব দেখাতে পারে না, তা নির্জীব ধ্বণীমাত্র।"[৬]

সংগীত শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম যুগে সংগীতকে মহাজাগতিক গ্রহ-নক্ষত্র, সংখ্যাতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ক্রমেই এ ধারণা পরিবর্তিত হয়ে ভাববাদের দিকে ঝুঁকছে।

পরবর্তী বেশ কিছু সময়, রেনেসাঁসের সময় পর্যন্ত ইউরোপে সংগীত সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা দেখা যায় না। রেনেসাঁস পরবর্তী সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর জিওসেফো জারলিনো'র (১৫১৭-১৫৯০) সংগীত বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জারলিনো সুরের

ভাবদ্যোতক ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেন। জারলিনোর মতে কোন সুরের কী আবেদন, শ্রোতার কানেই তা বিচার্য। কাব্যসংগীতে সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারলিনো কবিতার বিষয়বস্তু ও কথার গীতিময়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। কবিতার মূল সুরের সাথে আরোপিত সংগীত সুরের মিলন হচ্ছে কিনা, গানে (কাব্যসংগীত) তাই মূল কথা। কাব্যের যেমন গীতিময়তা আছে, সংগীতেরও তেমনি স্বরসঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব সুর আছে। কবিতা ও সংগীতের সুরগত ঐক্যেই গানের উৎকর্ষ।

শিল্পে নতুন ভাবধারার অভ্যুদয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান্টিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ক্ল্যাসিক্যাল রীতির মননশীলতা ও প্রথাসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এই সময়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে। সংগীতকে তাঁরা বৌদ্ধিক প্রকাশের চেয়ে অনুভূতি বা হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ বলে মনে করলেন। সংগীতে অনুভব, হৃদয়বৃত্তিকে কেন্দ্র করে একটি নতুন মতধারা সৃষ্টি হল। এই ধারার সমসাময়িক দার্শনিক হলেন জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), ডেলেম্বার্ট (১৭১৩-১৭৮৪), ডেনিস ডিডেরট (১৭১৭-১৭৮৩)। রুশোর মতে আদিম মানুষের বাক্‌ভঙ্গীর উৎকর্ষিত রূপ ভাষা ও সংগীত। আদিম মানুষ বাক্‌ভঙ্গীর মাধ্যমেই তার চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করত। চিন্তার যৌক্তিক প্রকাশের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে ভাষা আর সুর এসেছে ভাব- অনুভবের তাগিদে। কাজেই সংগীতের প্রকাশ ভাবেরই প্রকাশ। ডেনিস ডিডেরট এর মতে সংগীত কল্পনার দ্বারকে উন্মুক্ত করে। কেননা সংগীতের সুরসমন্বয়ের তাৎপর্য সহজেই অনুভূত হয়।

এই সময় থেকে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সংগীতের নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদগুলি যৌক্তিক স্পষ্টরূপ ধারণ করতে থাকে। সংগীতচিন্তা গ্রহণ নক্ষত্র ও সংখ্যাতাত্ত্বিক রহস্য থেকে মুক্ত হয়ে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ এর দিকে ঝুঁকেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সংগীতচিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হচ্ছে ভাববাদ, এই সময় থেকে সাংগীতিক মতবাদ নিয়ে শুধু দার্শনিক বা সংগীততত্ত্ববিদরা নয়, সৃজনশীল শিল্পীরাও বেশ আকৃষ্ট হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাববাদী সংগীতচিন্তার পক্ষে বিপক্ষে যে বাদানুবাদ সৃষ্টি

হয়েছিল সে বিষয়ে কতিপয় আলোচনাকারী হচ্ছেন জার্মান সংগীতকার সি.পি.ই.বাখ (১৭১৪-১৭৮৮), জি.ই. লেসিং (১৭২৯-১৭৮১), দানিয়েল শুবার্ট, উইলহেল্ম হাইনজে (১৭৪৬-১৮০৩)। এবার তাঁদের মতবাদ বিষয়ে আলোচনা করা যাক– বাখ এর মতে "একজন সংগীতজ্ঞ যতক্ষণ না নিজে ভাবে আবিষ্ট হচ্ছেন ততক্ষণ অন্যকে মুগ্ধ করতে পারেন না। নিজের মনে ভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই অন্যের মনে ভাব সঞ্চার করা সম্ভব।"[৭] শুবার্টের মতে "সুরকারের কাজ আবেগকে রূপ দেওয়া নয় নিজেকে উজাড় করে দেওয়া, হৃদয় অভিব্যক্ত করা।"[৮] উইলিয়াম হাইনজে সংগীতকে বলেছেন "আবেগ মুক্তির উপায়," "ভাবোচ্ছাসের সহায়ক।"[৯]

উল্লেখ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ভাববাদী সংগীতচিন্তা ভাব প্রকাশের বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে দুটি মূলধারায় বিভক্ত সংগীতে ভাব আত্মগত না আত্মনিরপেক্ষ। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা করব। উপরোক্ত আলোচনা আমরা সংগীতচিন্তাবিদদের মতবাদ বা ধারণার কথাই ব্যাখ্যা করেছি। এবার দৃষ্টি দেয়া যাক সমসাময়িক দার্শনিকরা সংগীত সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন তার উপর। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে 'সংগীতের মোহিনী শক্তি অসাধারণ কিন্তু সংগীতের আনন্দ শ্রবণসুখমাত্র।'[৭] শ্রেণী বিচারে কান্ট সংগীতকে নিম্নশ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন কেননা তাঁর মতে তাৎক্ষণিক শ্রবণসুখই সংগীতের উপজীব্য। সংগীতের মাধুর্যগুণ এবং ভাবোদ্দীপন ক্ষমতার কথা স্বীকার করেও কান্ট সংগীতকে সুন্দর আখ্যা দেননি। বিশুদ্ধ সংগীত সম্বন্ধে কান্টের বক্তব্য এই যে শিল্পের তুলনায় তা নিম্নমানের, কেননা সাংগীতিক রম্যতা বা আবেদনই এর একমাত্র উপজীব্য। কাব্যসংগীতে সংগীতের স্বরূপ ক্ষুণ্ন হয় ঠিকই শিল্প হিসেবে এর মূল্য বেড়ে যায়। জি,ডব্লিউ, এফ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) কাছে বিশুদ্ধ সংগীত অর্থাৎ বিষয়মুক্ত সংগীত শূণ্যগর্ভ ও অর্থহীন একজন সংগীতকার বিশুদ্ধ সুরে নয় কথার সাহায্যেই নিজস্ব অনুভূতিকে বিষয়াকারে রূপ দেন। পরবর্তী সময়ের দার্শনিক শোপেনহাওয়ার শিল্প হিসেবে সংগীতশিল্পকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে অন্যান্য আইডিয়ার প্রতিরূপ আর সংগীতের উপজীব্য এর সৃষ্টি প্রেরণা, অনুকরণ নয়। বস্তুস্বরূপেই সংগীতের সৌন্দর্য।

উনবিংশ শতাব্দীর সংগীত চিন্তাবিদ জিটি ফেচনার (১৮০১-১৮৮৭) ও থিওডর ভিসার (১৮০৭-১৮৮৭) ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতের ভাববাদী স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ফেচনারের মতে সংগীত ভাবের দ্যোতক নয়, হৃদয়ানুভূতির রূপ। আবার ভিসার বলেছেন যে সংগীত হচ্ছে সুর ও অনুভবের এক অবিভাজ্য সমগ্র। তাঁর মতে সংগীত হচ্ছে সুরেলা অনুভূতি (Sounding emotion).

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রোগ্রাম মিউজিকের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কোন বিষয়বস্তুকে সংগীতের মাধ্যমে রূপ দেয়া অর্থাৎ সুরে প্রকাশ করাই প্রোগ্রাম মিউজিকের উদ্দেশ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রোগ্রাম মিউজিকের চরম উৎকর্ষের সময় সংগীতের মাধ্যমে কোন গল্পের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী মনে করা হত। সংগীতের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বা ঘটনার রূপদানের জন্য সুরের মাধ্যমে নানারকম অভিব্যক্তি, যেমন হাসি, কান্না, সুখ দুঃখ, গতিভঙ্গী যেমন- ওঠানামা, দৌড়ানো থমকে দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রকাশ করা হত। শুধু মনের অনুভূতি নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ এমনকি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহকেও সংগীত রূপ দিতে পারে এরকম একটি ধারণাও সমসাময়িক সংগীতচিন্তায় প্রকাশ পেতে থাকে। সংগীতের ভাববাদী, অনুভবভিত্তিক প্রকাশের ধারণাটিই চূড়ান্ত রূপ ধারণ করতে থাকে এই সময়। এই অনুভব ভিত্তিক সংগীতধারণায় আরেক প্রবক্তা ছিলেন সমসাময়িক জার্মান সুরকার রিচার্ড ওয়াগনার (১৮১৩-১৮৮৩)। ওয়াগনার প্রবর্তিত music drama এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই রচিত হত। ওয়াগনারের মতে অনুভূতির ইন্দ্রিয় হচ্ছে ধ্বণী এবং তার শিল্পমাধ্যম হচ্ছে সংগীত। এখানে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ভাববাদী সংগীতচিন্তায়, পাশ্চাত্য প্রভাবে, বিশেষ করে সংগীতে সংলাপধর্মিতা প্রকাশে ওয়াগনার এর সংগীত মতবাদ এবং music drama দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সরের ভাববাদী মতবাদ (যার মূল বক্তব্য হল সংগীত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গীর সুরময় রূপ) এর দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় ভাববাদ ও রূপবাদ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এই সময়ের অনুভবভিত্তিক, ভাবধর্মী ও জীবনধর্মী সংগীত মতবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানালেন জার্মানীর এডুয়ার্ড হ্যান্সলিক (১৮২৫-১৯০৪)। তাঁর মতে সংগীত ভাবোদ্দীপক অনুভূতির প্রকাশক বলে অদ্যাবধি যে ধারণা করা হচ্ছে তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ সংগীত যখন তার স্বরূপ প্রকাশ করে আবেগ অনুভূতি তখন ঝাপসা হয়ে আসে। সংগীতের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে কোন নির্দিষ্ট ভাব বা বস্তুর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে পারে। সংগীত পারে শুধু মনের গতিধর্মের সহায়ক হতে, ভাবের গতিকে রূপ দিতে ভাবকে নয়। সংগীত এক স্বনিয়ন্ত্রিত রূপ, সুরের বিশিষ্ট বিন্যাসেই সুরসৌন্দর্য, সংগীতের আনন্দ তাই রূপসৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ, আবেগে উদ্বেলিত হবার আনন্দ নয়।

হ্যান্সলিকের এই মতবাদ প্রচণ্ড আঘাত হানে প্রচলিত ভাবধর্মী ও জীবনধর্মী সংগীত সংস্কারে, অনুকৃতিবাদের পরে প্রাচীনকাল থেকে ভাববাদী সংগীতচিন্তার স্পষ্টত বিরুদ্ধে দাঁড়ালো হ্যান্সলিকের সাংগীতিক রূপবাদের। আবার হ্যান্সলিকের এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি অনেকের আগ্রহও বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও সংগীতচিন্তা স্পষ্টত দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ভাববাদ ও রূপবাদকে কেন্দ্র করে সংগীততাত্ত্বিকদের এই বিতর্ক অদ্যাবধি চলছে। ভারতীয় সংগীতের মূলকথা রস। এই রসবাদ মূলত ভাববাদেরই নামান্তর। হ্যান্সলিকের এই মতবাদকে স্বীকার করতে গেলে ভারতীয় সংগীতের রসতত্ত্বকে অস্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।		Harvard Dictionary	১৪
২।	Eric Blom	Everymans Dictionary of Music. J.M. Dent and Sons Ltd. London (1934)	৪৭১
৩।	অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	৫
৪।	প্রাগুক্ত		৫
৫।	প্রাগুক্ত		১২
৬।	প্রাগুক্ত		১২
৭।	প্রাগুক্ত		১৭
৮।	প্রাগুক্ত		১৭
৯।	প্রাগুক্ত		১৭

পাশ্চাত্য সংগীত চিন্তায় ভাববাদ ও রূপবাদ

সংগীতের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার ক্রমবিকাশে আমরা লক্ষ্য করেছি, শিল্প ও দর্শনের প্রাথমিক যুগের (প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল এর সময়) অনুকৃতিবাদ এর পরে মূলত এই আলোচনা ভাববাদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সংগীতে বাস্তববাদ এবং আবেগবাদ মূলত ভাব প্রকাশেরই ভিন্ন ধরণ। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে এডুয়ার্ড হ্যান্সলিকই প্রথম এই মতবাদের বিপরীত অবস্থান নেন তাঁর Beautiful in Music গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি সংগীতের রূপধর্মিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই অধ্যায়ে আমরা সংগীতের ভাববাদ ও রূপবাদ বিষয়ে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করব। প্রথমে ভাববাদ প্রসঙ্গে আসা যাক।

সংগীতের ভাববাদ প্রসঙ্গে ভাববাদী চিন্তাবিদদের মতবাদ অনেকটা এই ধরণের যে, প্রাথমিক যুগ থেকেই মানুষের ভাব প্রকাশে যেখানে আবেগের প্রাধান্য এসেছে সেখানেই সুরের ছোঁয়া লেগেছে। ভাব প্রকাশে এই সুরের ছোঁয়াতেই উপ্ত ছিল সংগীতের বীজ। ভাষার সুরের উৎকর্ষিত রূপই হচ্ছে সংগীত। অন্যভাবে বলতে গেলে সংগীতের বিবর্তন প্রকারান্তরে ভাষার ভাব প্রকাশেরই বিবর্তন।

আমরা প্রথমেই বলেছি সংগীতের ভাববাদী মতবাদটি অতি প্রাচীন। পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার এই ভাববাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে আমরা এর ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌লের অনুকৃতিবাদ দিয়েই শুরু করা যাক।

শিল্পে অনুকৃতিবাদ সংগীতে ভাববাদী চিন্তারই নামান্তর। কেননা প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে "সংগীত অন্যান্য শিল্পকলার মতই অনুকরণ এবং ভাবের অনুকরণ"[১] অ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন "বিশুদ্ধ সুরেও ভাবের উপাদান আছে, কথার সংস্পর্শ মুক্ত হয়েও সুর হৃদয়কে স্পর্শ করে (Even melody without word has feeling). এবং সংগীতে যে ভাবের প্রকাশ ঘটে প্রকৃত অনুভূতির সঙ্গে তার বৈষম্য খুব কমই।"[২] অনুকরণতত্ত্বের দৃষ্টিতে

সংগীত বিষয়গত ভাবকে প্রকাশ করে, কোন তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে নয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল এর পরে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে সপ্তম শতাব্দীতে এসে আমরা ভাববাদী চিন্তার ধারক হিসেবে সেন্ট ইসিডরের নাম পাই। সংগীত সম্বন্ধে ইসিডরের মন্তব্য হল- "Music moves affection and calls forth feeling into a different dispostion."[৩] সহজ ভাষায় এর ব্যাখ্যা হল সংগীত ভাব উদ্দীপক এবং হৃদয় সংবেদী। এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন হ্রাবানুস মাউরুস দুই শতাব্দী পরে। Aesthetic of Music (Carl Dalhous) গ্রন্থে মাউরুসের উক্তি উল্লিখিত এইভাবে "Music moves affections and transports a listerner into changing condtions of the heart.[৪] পরবর্তী সময়ে সংগীতের অ্যাফেক্শন মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে জার্মান সংগীতচিন্তাবিদগণ এই অ্যাফেকশনতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। এই তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তার নাম উল্লেখ করছি। এ. রেকমিস্টার (১৭০২), জে.ভি হাইনশেন (১৭১১), জে.ম্যাথেসন(১৭৩৯), জে. জে.কোয়ান্ৎস, (১৭৫২), এফ ডবলু মারপুর্গ (১৭৬৩)। এই মতবাদীরা বাগ্মী এবং সংগীতজ্ঞের তুলনা করে বললেন একজন বাগ্মী যেমন বাক্কৌশলে শ্রোতার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনি একজন সংগীতজ্ঞ বা সুররচয়িতাও রচনা কৌশলে শ্রোতার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। জে.জে কোয়ানৎস স্পষ্টতই বললেন একজন বাগ্মী এবং একজন শ্রোতার লক্ষ্য স্পষ্টতই এক (The Orator and the musician have, at botom the same aim") জে. ম্যাথেসন সাংগীতিক আনন্দের ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে যে, সঠিক স্বরচয়ন এবং স্বরসমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তরিক ভাবের নিখুঁত রূপদান এবং শ্রোতাকে সেই ভাবে উদ্বেলিত করা। (A composer must know how to express truly all the hearts inclinations by means merely of carefully chosen sounds and their skillfull combination without words, so that a listener can completely grasp and clearly understand the motive, sense, meaning and force then it is a delight."[৫] লক্ষণীয় যে অ্যাফেকশনতত্ত্বের বক্তব্যে ভাব প্রকাশের কলাকৌশল এবং শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করাই প্রাধান্য পায়, শিল্পীর আন্তরিক ভাববাদের বিষয়টি এ তত্ত্বে আড়ালে থেকে যায়।

সমকালীন ফরাসী সংগীতচিন্তাবিদ শার্ল বাতোর (১৭১৩) সংগীত প্রকাশ কথাটি উপস্থাপন বা বর্ণনের সমার্থক বলে ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর মতে চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্মের মতো, একজন সুরকার নান্দনিক সুর সমন্বয়ের মাধ্যমে মনোভাবকেই প্রতিবিম্বিত করেন এবং সাংগীতিক আনন্দ নির্ভর করে সুর সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত, প্রতিচিত্রিত ভাবের বাস্তবতার বর্ণনাসত্যতায়। উল্লেখ্য পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অ্যারিস্টটল এর অনুকরণবাদী সংগীতচিন্তার সাথে এর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। সমকালীন দার্শনিক জাঁ বাতিস্তা দুবো (১৭০৯) এবং জঁ জাক রুশোর সংগীত ব্যাখ্যায়ও একই মতবাদ প্রতিধ্বনি হয়েছে।

উপরে বর্ণিত দুটি মতবাদের একটিতে সংগীত চাতুর্যের মাধ্যমে শ্রোতাকে মুগ্ধ করা, শ্রোতার আবেগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। অন্যটিতে স্বরের মাধ্যমে ভাব প্রকাশই মূল কথা, বিষয় বর্ণনায় আন্তরিক। এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করলেন সি.পি.ই. বাখ, দানিয়েল শুবার্ট প্রমুখ সংগীত গুণীরা। তাঁরা বললেন শ্রোতাকে উদ্দীপিত করা বা ভাবকে অনুকরণ করা নয়, আপনাকে প্রকাশ করা, অন্তর উদ্‌ঘাটিত করাই শিল্পীর কাজ (To forcement his selfhood in music.[৬] সিপিই বাখ বললেন যে শিল্পী নিজে শিল্প রচনায় বিভোর হলে তবেই শ্রোতাকে অভিভূত করা সম্ভব। বাখের নিজের কথায়- "Since a musician cannot otherwise move people but he be moved himself so he must necessarily be able to induce in himself all those effects which he would around in his auditors; he conveys his feelings to them and thus most rapidly moves than to symphathetic emotions."[৭] নৈর্ব্যাক্তিকতা নয় শিল্পীর মর্মবেদনার শিল্পিত প্রকাশই সংগীত।

এবার আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংগীতালোচনায় আসছি। ইংরেজ কবি হার্বাট স্পেন্সর এর মতে আমাদের মনোদৈহিক উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরের যে পরিবর্তন হয় তারই উৎকর্ষিত রূপ হচ্ছে সংগীত। স্পেন্সরের ভাষায় "Variations of voice are the physiological results of variations of feelings".[৮] প্রবন্ধে স্পেন্সর বিশ্লেষণ

করে দেখালেন যে অনুভূতির তারতম্যে মানুষের কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীতে তারতম্য হয় সুরের আমেজ আসে। সংগীত এই প্রকাশভঙ্গীরই বহুসংস্কৃত রূপ। এ বিষয়ে আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। "Everyone of the alterations of voice which we have found to physiological result of pain and pleasure is carried to its greatest extreme in vocal music (Essays; Scientific, Political and Speculative).[৯] সাধারণভাবে মনে হয় এই আলোচনা শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীতের জন্য প্রযোজ্য। এই বিষয়ে স্পেন্সর আমাদের কণ্ঠকে অর্থাৎ স্বরযন্ত্রকে যন্ত্র আখ্যায়িত দিয়েছেন এবং সব দেশের সংগীত ইতিহাসেই কণ্ঠের সহযোগী রূপেই সংগীতযন্ত্রের নির্মিতি। কাজেই কণ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রে উৎপন্ন হলেও তার মূল উৎপত্তি মানববৃত্তির সংগীতপ্রবণতার অভ্যন্তরে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের সংগীতভাবনায় স্পেন্সরের এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীতবিদ রিচার্ড ওয়াগনার এর মতে সংগীত ব্যক্তির মর্মবেদনা প্রকাশ করে না। সংগীত তার আত্মঐশ্বর্যেই বেদনা বা আনন্দের প্রকাশ করে। সংগীতে এই নৈব্যক্তিক অনুভূতির যে স্বরূপ উৎঘাটিত হয় তা আর কোন শিল্পেই হয় না।

বিংশ শতাব্দীর সংগীত চিন্তাবিদ সুশান ল্যাঙ্গারের সংগীত বিশ্লেষণের মূল কথা এই যে, "সংগীত আমাদের নিত্যকার জীবনের আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতির প্রতিচ্ছবি নয়। হৃদয়ের মর্মমূলে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চরণ, সংগীত তারই ইঙ্গিতবাহী।"[১০] কিছুকাল পরে রোজার সেশন্স প্রায় একই কথা বলেন। রোজার সেশন্স এর বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, "নির্দিষ্ট অর্থে ভাব বলতে যা বুঝি সংগীত তা নয়, সংগীত হল সর্বপ্রকার অনুভূতির মূলীভূত শক্তি।"[১১]

উপরোক্ত আলোচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংগীতে ভাববাদ বিষয়টি মোটামুটি দুটি ধারায় বিভক্ত। একদলের মতে শিল্পী মানবীয় আবেগকে সংগীতের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। অন্যপক্ষ প্রাধান্য দিচ্ছেন হৃদয় অনুভূতির মর্মমূলকে। অর্থাৎ সংগীত শিল্পীহৃদয়ের মর্মগ্রাহী রূপ অথবা শিল্পী হৃদয়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিশ্বজনের অন্তর্বেদনার চিত্র।

সংগীতে ভাবাবেগকে আশ্রয় করে জীবনচর্যার মাধ্যমে সংগীতের মর্মানুসন্ধানের যে চেষ্টা এ যাবতকাল চলে এসেছে, তা প্রথম হোঁচট খায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে। সংগীতে রূপবাদী মতবাদের বক্তব্য এই যে, ভাববাদী সংগীতচিন্তার মরীচিকা সংগীত সত্যে উপনীত হওয়ার পরিবর্তে সংগীত চিন্তার বিবর্তনকে ভুল পথে চালিত করেছে। সংগীত ভাবাবেগ নিরপেক্ষ আত্মসুন্দর একটি বিষয়। সংগীত সংগীতই, সে তার আপন বিন্যাসভিত্তিক রূপেই সার্থক। স্বরবিন্যাস গত সৌন্দর্যই সংগীতসৌন্দর্যের মূল কথা। সংগীতে রূপধর্মিতার এই বিষয়টির প্রথম প্রবক্তা এডুয়ার্ড হ্যান্সলিক।

উল্লেখ্য শিল্পে রূপবাদের এই ব্যাখ্যা শিল্পতত্ত্বে নতুন নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিল্পতত্ত্বের Formalism কেই আধুনিক পরিভাষায় Configuration আখ্যা দেয়া যেতে পারে। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পে সৌন্দর্যের উপলব্ধির জন্য 'Organic unity' বা 'Unity and sense of the whole' এর আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। এই ঐক্য এবং সুষমা প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকৃতিকে আশ্রয় করে থাকলেও শিল্পের সৌন্দর্যবিচারে এই ঐক্য ক্রমেই নিরপেক্ষতার মর্যাদা লাভ করে। এবং ঐক্য ও সুষমাই শিল্পের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যই form যা শিল্পী সৃষ্টি করতে চান। পরবর্তীকালে সিসেরো, সেন্ট অগাস্টাইন প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের সৌন্দর্যচিন্তায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়।

শিল্প হিসেবে সংগীতের এই স্বতন্ত্র উপলব্ধি, স্বকীয়তা, প্রাচীন সংগীতালোচনায়ও বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টকসেনাস এর উক্তিতে আমরা এই মতবাদের পূর্বাভাস খুঁজে পাই- "Music is a self contained phenomenological system and significant form of any work is not derived from its relation to any other reality, but is identical with the principal of its own organization."[১২]

রোমের দার্শনিক সেক্সটাস এমপরিকাসও সংগীতকে ভাব প্রকাশক না বলে "সুর ও রূপ নিয়ে খেলা" বলে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর দার্শনিক জারলিনোর মতে কবিতার বিষয় বহিরাগত ভাবের যা ঐ ভাবেরই অর্থদ্যোতক কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে এর বিষয়বস্তু

সুরসমঞ্জস রূপে এর নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। হ্যান্সলিকের অব্যবহিত পূর্বেই জোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (১৮০৮) শিল্পদর্শনে রূপবাদী মতবাদ প্রকাশ করেন, যার মূলকথা রূপই শিল্পের সম্পদ ভাব নয় (The values of art lies in its formal relations and not in its expressiveness). হ্যান্সলিক তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের রূপবাদী মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হ্যান্সলিকই তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একে একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিশিষ্ট মতবাদের স্তরে উত্তীর্ণ করলেন। 'সংগীতের সৌন্দর্য আবেগের যথাযথ অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করে' এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে হ্যান্সলিক তাঁর রূপধর্মী মতবাদকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি। এই বিষয়ে তাঁর মূল কথাগুলি সাধন ভট্টাচার্যকৃত হ্যান্সলিকের 'Beautiful in Music' এর অনুবাদ 'সংগীতে সুন্দর' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

"এর (সংগীতের) প্রকৃতি বিশেষভাবে সুরগত। এ বলতে আমরা বুঝি সুন্দর কোন বাহ্যিক বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, বাহ্যিক বিষয়বস্তুসাপেক্ষ নয়; কৌশলে বিন্যস্ত নিছক ধ্বনির মধ্যেই সৌন্দর্য নিহিত। স্বতোমধুর ধ্বনির কৌশলপূর্ণ সমন্বয়, তাদের সঙ্গতি এবং বিরোধ, তাদের দূরে-সরে-যাওয়া এবং আবার কাছে-ফিরে-আসা, তাদের ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তি এই সব দিয়ে সৃষ্ট, যুক্ত এবং অব্যাহত রূপ আমাদের মানস দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়।

সংগীতের আদিমতম উপাদান হচ্ছে শ্রুতিমধুর শব্দ এবং ছন্দ হচ্ছে এর আত্মা। সাধারণ ছন্দ অথবা সমমাত্রিক সংগঠনের সুসঙ্গতি বিশেষ ছন্দ অথবা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে এর বিভিন্ন অংশের সুনিয়ত পারস্পরিক গতি।

যে কাঁচামাল নিয়ে সংগীত রচয়িতাকে কাজ করতে হয়– অবশ্য তার বিশাল পরিমাণ সম্পূর্ণ পরিমাপ করা অসম্ভব, তা হচ্ছে সুরধ্বনির সমগ্র পরদা এবং রাগরাগিণীর সুরসঙ্গতি এবং ছন্দের অসংখ্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাদের অভিযোজন করবার সহজ ক্ষমতা। সুর-অফুরন্ত সুরই-প্রধানতঃ সংগীত-সৌন্দর্যের উৎস। সুরসঙ্গতি (হারমোনি) তার পরিবর্তনের, আবর্তনের

এবং উদ্দীপনের অসংখ্য রীতি নিয়ে, নতুন নতুন সৃষ্টি উপাদান যুগিয়ে আসছে; আর ছন্দ, যাকে সংগীত-দেহের প্রধান ধমনী বলা যেতে পারে, ঐ দুয়েরই নিয়ামক এবং তার বহু বৈচিত্র দিয়ে সুরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

এই সমস্ত উপাদান দিয়ে কি প্রকাশ করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর 'সাংগীতিক ধারণা' বা আদর্শ (মিউজিকাল আইডিয়া) এই সাংগীতিক ধারণা সমগ্রভাবে উপস্থাপিত হলে, শুধু যে প্রকৃত সৌন্দর্যেরই বিষয় হয় তাই নয়, তা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যও বটে এবং তা আবেগ এবং চিন্তাকে উপস্থাপিত করার উপায়বিশেষ নয়।"

হ্যান্সলিক সংগীতের ভাববাদী মতবাদ অর্থাৎ সংগীত ভাব উদ্দীপিত করে এবং ভাবের প্রকাশেই সংগীতের সার্থকতা এই মতবাদ খণ্ডন করে বলেছেন যে সব শিল্পই সুন্দরকে রূপ দিতে চেষ্টা করে এবং এতেই তার সার্থকতা, সুন্দরের আবেদন আমাদের অনুভূতিতে নয় ধ্যানের ইন্দ্রিয়ে। কাজেই শিল্প হিসেবে সংগীতেরও কাজ সুন্দরকে প্রকাশ। সংগীত আবেগ প্রকাশক নয়, কারণ- "There is no invariable and inevitable nexus between musical works and certain state of mind."[১২] সংগীত আবেগকে প্রকাশ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে আবেগের গতি ধর্মের প্রতি সাংগীতিক গতিসহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সংগীতসৌন্দর্যের উৎস হচ্ছে সাংগীতিক উপাদান যেমন মেলোডি, হারমনি, রিদম। এই সব উপাদানের মাধ্যমে musical idea প্রকাশ করাই সংগীতের উদ্দেশ্য। ভাব বা আবেগ নয়, সংগীত তার রূপগত বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। সংগীতসৌন্দর্য হচ্ছে ধ্বণীবিন্যাসের সুষমা "Consists wholly of sounds artistically combined."

সংগীত সম্বন্ধে ইসিডরের মন্তব্য হল- Music moves affection and calls forth feeling into a different dispostion. সহজ ভাষায় এর ব্যাখ্যা হল 'সংগীত ভাব উদ্দীপক এবং হৃদয় সংবেদী'। হ্রাবানুস মাউরুস দুই শতাব্দী পরে এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন। (Aesthetic of Music (Carl Dellous) গ্রন্থে মাউরুসের উক্তি উল্লিখিত

এইভাবে "Music moves effections and transports a listerner into changing condtions of the heart. পরবর্তী সময়ে সংগীতের অ্যাফেকশন মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে জার্মান সংগীতচিন্তাবিদগণ এই অ্যাফেকশনতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। এই তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তার নাম উল্লেখ করছি। এ. রেকমিস্টার (১৭০২), জে.ভি হাইনশেন (১৭১১), জে ম্যাথেসন (১৭৩৯) জে. জে. কোরান্‌ৎস (১৭৫২), এফ ডবলু মারপুর্গ (১৭৬৩)। এই মতবাদীরা বাগ্মী এবং সংগীতজ্ঞের তুলনা করে বললেন একজন বাগ্মী যেমন বাক্ কৌশলে শ্রোতার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনি একজন সংগীতজ্ঞ বা সুররচয়িতাও রচনা কৌশলে শ্রোতার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। জে.জে কোয়ানৎস স্পষ্টতই বললেন একজন বাগ্মী এবং একজন শ্রোতার লক্ষ্য স্পষ্টতই এক (The Orator and the musician have at botom the same aim. Grove Dictionary Page 125). জে. ম্যাথেসন সাংগীতিক আনন্দের ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে যে সঠিক স্বরচয়ন এবং স্বরসমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তরিক ভাবের নিখুঁত রূপদান এবং শ্রোতাকে সেই ভাবে উদ্বেলিত করা। (A composer must know how to express truly all the hearts inclinations by means merely of carefully chosen sounds and their skillfull combination without words, so that a listener can completely grasp and clearly understand the motive, sense, meaning and force then it is a delight." Aesthetics of Music, Carl Dalhous, Page-25). লক্ষণীয় যে অ্যাফেকশনতত্ত্বের বক্তব্যে ভাব প্রকাশের কলাকৌশল এবং শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করাই প্রাধান্য পায়, শিল্পীর আন্তরিক ভাববাদের বিষয়টি এতত্ত্বে আড়ালে থেকে যায়।

সমকালীন ফরাসী সংগীতচিন্তাবিদ শার্ল বাতোর (১৭১৩) সংগীতপ্রকাশ কথাটি উপস্থাপন বা বর্ণনের সমার্থক বলে ব্যাখ্যা ছিলেন। তাঁর মতে চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্মের মতো, একজন সুরকার নান্দনিক সুর সমন্বয়ের মাধ্যমে মনোভাবকেই প্রতিবিম্বিত করেন এবং সাংগীতিক আনন্দ নির্ভর করে সুর সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত, প্রতিচিত্রিত ভাবের বাস্তবতার

বর্ণণসত্যতায়। উল্লেখ্য পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অ্যারিস্টটল এর অনুকরণবাদী সংগীতচিন্তার সাথে এর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। সমকালীন দার্শনিক বার্তিক দুবো (১৭০৯) এবং জঁ জাক রুশের সংগীত ব্যাখ্যায়ও একই মতবাদ প্রতিধ্বনি হয়েছে।

উপরে বর্ণিত দুটি মতবাদের একটিতে সংগীতচাতুর্যের মাধ্যমে শ্রোতাকে মুগ্ধ করা শ্রোতার আবেগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। অন্যটিতে স্বরের মাধ্যমে ভাব প্রকাশই মূল কথা, বিষয় বর্ণনায় আন্তরিক। এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করলেন সিপিই বাখ, দানিয়েল শুবার্ট প্রমুখ সংগীতগুণীরা। তাঁরা বল্লেন শ্রোতাকে উদ্দীপিত করা বা ভাবকে অনুকরণ করা নয়, আপনাকে প্রকাশ করা, অন্তর উদ্‌ঘাটিত করাই শিল্পীর কাজ (To forcement his selfhood in music), Aesthetics of Music, Karl Dalhouse, Page 21). সিপিই বাখ বল্লেন যে শিল্পী নিজে শিল্প রচনায় বিভোর হলে তবেই শ্রোতাকে অভিভূত করা সম্ভব। "বাখের নিজের কথায়- "Since a musician cannot otherwise move people but he be moved himself so he must necessarily be able to induce in himself all those effects which he would arouse in his auditors; he conveys his feelings to them and thus most rapidly moves than to symphathetic emotions." (*সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা*, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হতে উদ্ধৃত) নৈব্যাক্তিকতা নয় শিল্পীর মর্ম্মবেদনার বিমূর্ত প্রকাশই সংগীত।

এবার আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংগীতালোচনায় আসছি। ইংরেজ কবি হার্বাট স্পেন্সর এর মতে আমাদের মনো দৈহিক উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরের যে পরিবর্তন হয় তারই উৎকর্ষিত রূপ হচ্ছে সংগীত। স্পেন্সরের ভাষায় "Variations of voice are the physiological results of variations of feelings" (Essays: Scientific, Political and spequlative গ্রন্থে Origin and Function of Music *সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা* থেকে উদ্ধৃত)। *The Origin and Function of Music"* প্রবন্ধে স্পেন্সর বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে অনুভূতির তারতম্যে মানুষের মাংসপেশীর মধ্যে তারতম্য ঘটে, উত্তেজিত স্বরে সুরের আমেজ আসে। সংগীত এই প্রকাশভঙ্গীরই বহুসংস্কৃত রূপ। এ বিষয়ে আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। "Everyone of

the alteratons of voice which we have found to physiological result of pain and pleasure is carried to its greatest extreme in vocal music *(Eassays; Scientific, Political and Speculative)*. সাধারণভাবে মনে হয় এই আলোচনা শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীতের জন্য প্রযোজ্য। এই বিষয়ে স্পেন্সর আমাদের কণ্ঠকে অর্থাৎ স্বরযন্ত্রকে যন্ত্র আখ্যায়িত দিয়েছেন এবং সব দেশের সংগীত ইতিহাসেই কণ্ঠের সহযোগী রূপেই সংগীতযন্ত্রের নির্মিতি। কাজেই কণ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রে উৎপন্ন হলেও তার মূল উৎপত্তি মানববৃত্তির সংগীতপ্রবণতার অভ্যন্তরে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের সংগীতভাবনায় স্পেন্সরের এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীতবিদ রিচার্ড ওয়াগনার এর মতে সংগীত ব্যক্তির মর্মবেদনা প্রকাশ করে না। সংগীত তার আত্ম ঐশ্বর্যেই বেদনা বা আনন্দের প্রকাশ করে। সংগীতে এই নৈব্যক্তিক অনুভূতির যে স্বরূপ উৎঘাটিত হয় তা আর কোন শিল্পেই হয় না।

বিংশ শতাব্দীর সংগীত চিন্তাবিদ সুশান ল্যাঙ্গারের সংগীত বিশ্লেষণের মূল কথা এই যে, "সংগীত আমাদের নিত্যকার জীবনের আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতির প্রতিচ্ছবি নয়। হৃদয়ের মর্মমূলে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চরণ, সংগীত তারই ইঙ্গিতবাহী।" কিছুকাল পরে রোজার সেশন্‌স প্রায় একই কথা বলেন। রোজার সেশন্‌স এর বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, "নির্দিষ্ট অর্থে ভাব বলতে যা বুঝি সংগীত তা নয়, সংগীত হল সর্বপ্রকার অনুভূতির মূলীভূত শক্তি।"

উপরোক্ত আলোচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংগীতে ভাববাদ বিষয়টি মোটামুটি দুটি ধারায় বিভক্ত। একদলের মতে শিল্পী মানবীয় আবেগকে সংগীতের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। অন্যপক্ষ প্রাধান্য দিচ্ছেন হৃদয় অনুভূতির মর্মমূলকে। অর্থাৎ সংগীত শিল্পীহৃদয়ের মর্মগ্রাহী রূপ অথবা শিল্পী হৃদয়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিশ্বজনের অন্তর্বেদনার চিত্র।

সংগীতে ভাবাবেগকে আশ্রয় করে জীবনচর্যার মাধ্যমে সংগীতের মর্মানুসন্ধানের যে চেষ্টা এ যাবৎকাল চলে এসেছে, তা প্রথম হোঁচট খায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে। সংগীতে রূপবাদী মতবাদের বক্তব্য এই যে, ভাববাদী সংগীতচিন্তার মরীচিকা সংগীত সত্যে উপনীত

হওয়ার পরিবর্তে সংগীত চিন্তার বিবর্তনকে ভুল পথে চালিত করেছে। সংগীত ভাবাবেগ নিরপেক্ষ আত্মসুন্দর একটি বিষয়। সংগীত সংগীতই, সে তার আপন বিন্যাসভিত্তিক রূপেই সার্থক। স্বরবিন্যাস গত সৌন্দর্যই সংগীতসৌন্দর্যের মূল কথা। সংগীতে রূপধর্মিতার এই বিষয়টির প্রথম প্রবক্তা এডুয়ার্ড হ্যান্সলিক।

উল্লেখ্য শিল্পে রূপবাদের এই ব্যাখ্যা শিল্পতত্ত্বের নতুন নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিল্পতত্ত্বের Formalism কেই আধুনিক পরিভাষায় Configuration আখ্যা দেয়া যেতে পারে। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পে সৌন্দর্যের উপলব্ধির জন্য 'Organic unity' বা 'Unity and sense of the whole' আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। এই ঐক্য এবং সুষমা প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকৃতিকে আশ্রয় করে থাকলেও শিল্পের সৌন্দর্যবিচারে এই ঐক্য ক্রমেই নিরপেক্ষতার মর্যাদা লাভ করে, এবং ঐক্য ও সুসমাই শিল্পের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যই form যা শিল্পী সৃষ্টি করতে চান। পরবর্তীকালে সিসেরো, সেন্ট অগাস্টাইন প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের সৌন্দর্য চিন্তায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়।

শিল্প হিসেবে সংগীতের এই স্বতন্ত্র উপলব্ধি, স্বকীয়তা, প্রাচীন সংগীতালোচনায়ও বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টকসেনাস এর উক্তিতে আমরা এই মতবাদের পূর্বাভাস খুঁজে পাই- "Music is a self contained phenomenological system and significant form of any work is not derived from its relation to any other reality, but is identical with the principal of its own organization."

রোমের দার্শনিক সেক্সটাস এমপেরিকাসও সংগীতকে ভাব প্রকাশক না বলে "সুর ও রূপ নিয়ে খেলা" বলে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর দার্শনিক জারলিনোর মতে কবিতার বিষয় বহিরাগত ভাবের যা ঐ ভাবেরই অর্থদ্যোতক কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে এর বিষয়বস্তু সুরসমঞ্জস রূপে এর নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। হ্যান্সলিকের অব্যবহিত পূর্বেই জোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (১৮০৮) শিল্পদর্শনে রূপবাদী মতবাদ প্রকাশ করেন, যার মূলকথা রূপই শিল্পের সম্পদ ভাব নয় (The values of art lies in its formal relations and

not in its expressiveness). হ্যান্সলিক তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের রূপবাদী মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হ্যান্সলিকই তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একে একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিশিষ্ট মতবাদের স্তরে উত্তীর্ণ করলেন। 'সংগীতের সৌন্দর্য আবেগের যথাযথ অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করে' এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে হ্যান্সলিক তাঁর রূপধর্মী মতবাদকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি। এই বিষয়ে তাঁর মূল কথাগুলি সাধন ভট্টাচার্যকৃত হ্যান্সলিকের 'Beautiful in Music' এর অনুবাদ 'সংগীতে সুন্দর' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

"এর (সংগীতের) প্রকৃতি বিশেষভাবে সুরগত। এ বলতে আমরা বুঝি সুন্দর কোন বাহ্যিক বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, বাহ্যিক বিষয়বস্তুসাপেক্ষ নয়; কৌশলে বিন্যস্ত নিছক ধ্বনির মধ্যেই সৌন্দর্য নিহিত। স্বতোমধুর ধ্বনির কৌশলপূর্ণ সমন্বয়, তাদের সঙ্গতি এবং বিরোধ, তাদের দূরে-সরে-যাওয়া এবং আবার কাছে-ফিরে-আসা, তাদের ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তি-এই সব দিয়ে সৃষ্ট, যুক্ত এবং অব্যাহত রূপ আমাদের মানস দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়।

সংগীতের আদিমতম উপাদান হচ্ছে শ্রুতিমধুর শব্দ এবং ছন্দ হচ্ছে এর আত্মা। সাধারণ ছন্দ অথবা সমমাত্রিক সংগঠনের সুসঙ্গতি বিশেষ ছন্দ অথবা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে এর বিভিন্ন অংশের সুনিয়ত পারস্পরিক গতি।

যে কাঁচামাল নিয়ে সংগীত রচয়িতাকে কাজ করতে হয়- অবশ্য তার বিশাল পরিমাণ সম্পূর্ণ পরিমাপ করা অসম্ভব-তা হচ্ছে সুরধ্বনির সমগ্র পরদা এবং রাগরাগিণীর সুরসঙ্গতি এবং ছন্দের অসংখ্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাদের অভিযোজন করবার সহজ ক্ষমতা। সুর-অফুরন্ত সুরই-প্রধানতঃ সংগীত -সৌন্দর্যের উৎস। সুরসঙ্গতি (হারমোনি) তার পরিবর্তনের, আবর্তনের এবং উদ্দীপনের অসংখ্যা রীতি নিয়ে, নতুন নতুন সৃষ্টি উপাদান যুগিয়ে আসছে; আর ছন্দ, যাকে সংগীত-দেহের প্রধান ধমনী বলা যেতে পারে, ঐ দুয়েরই নিয়ামক এবং তার বহু বৈচিত্রে দিয়ে সুরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

এই সমস্ত উপাদান দিয়ে কি প্রকাশ করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর 'সাংগীতিক ধারণা' বা আদর্শ (মিউজিকাল আইডিয়া) এই সাংগীতিক ধারণা সমগ্রভাবে উপস্থাপিত হলে, শুধু যে প্রকৃত সৌন্দর্যেরই বিষয় হয় তাই নয়, তা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যও বটে এবং তা আবেগ এবং তা আবেগ এবং চিন্তাকে উপস্থাপিত করার উপায়বিশেষ নয়।"

হ্যান্সলিক সংগীতের ভাববাদী মতবাদ অর্থাৎ সংগীত ভাব উদ্দীপিত করে এবং ভাবের প্রকাশেই সংগীতের সার্থকতা এই মতবাদ খণ্ডন করে বলেছেন যে সব শিল্পই সুন্দরকে রূপ দিতে চেষ্টা করে এবং এতেই তার সার্থকতা, সুন্দরের আবেদন আমাদের অনুভূতিতে নয় ধ্যানের ইন্দ্রিয়ে। কাজেই শিল্প হিসেবে সংগীতেরও কাজ সুন্দরকে প্রকাশ। সঙ্গতি আবেগ প্রকাশক নয়, কারণ- "There is no invariable and inevitable nexus between musical works and certain state of mind." সংগীত আবেগকে প্রকাশ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে আবেগের গতি ধর্মের প্রতি সাংগীতিক গতিসহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সংগীত সৌন্দর্যের উৎস হচ্ছে সাংগীতিক উপাদান যেমন মেলোডি, হারমনি, রিদম। এই সব উপাদানের মাধ্যমে musical idea প্রকাশ করাই সংগীতের উদ্দেশ্য। ভাব বা আবেগ নয়, সংগীত তার রূপগত বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। সংগীত সৌন্দর্য হচ্ছে ধ্বনীবিন্যাসের সুষমা "Consists wholly of sounds artistically combined."

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।	অমিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	২৫
২।	প্রাগুক্ত		২৬
৩।	প্রাগুক্ত		২৬
৪।	Dalhous, Carl	Esthetics of Music- 1982	১৭
৫।	প্রাগুক্ত		২৫
৬।	প্রাগুক্ত		২১
৭।	অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	২৯
৮।	Herbert Spencer	Essays', Scientific, Political and Spequalative William and Norgate London (1868).	২১৪
৯।	প্রাগুক্ত		২২১
১০।	অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	৩০
১১।	প্রাগুক্ত		৩০

403545

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রাচীন ভারতীয় সংগীতচিন্তা

একটি বিষয় প্রথমেই স্বীকার্য যে পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তা যেমন প্রাচীন কাল থেকে সুসঙ্গত ধারাবাহিকতার সাথে বিকাশ লাভ করেছে, ভারতীয় সংগীতচিন্তার ইতিহাস ঠিক তেমন ধারাবাহিকভাবে বিকাশ লাভ করেনি। প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে বরং কাব্য ও নাটক সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হয়েছে। সংগীতের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞা প্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রগুলি শ্রুতি, স্বর, রাগ, তাল ইত্যাদি প্রায়োগিক বিষয়ে যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে, তত গুরুত্ব দেয়নি এর স্বরূপ নির্ধারণে, সংগীতে ভাব- রূপের উৎস সন্ধানে। সংগীতের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যবাহকতা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা অনেকাংশেই পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত ও মন্তব্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এই সংগীতচিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি ভারতীয় সংগীতচিন্তায় ভাব ও রূপের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রাচীন এবং অতি প্রচলিত একটি সংজ্ঞা "গীতং বাদ্যং নৃত্যং ত্রয়ম সংগীতমুচ্যতে"[১] ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে সংগীত শব্দটির সার্থকতা প্রকাশে এই উক্তিটি করেছেন। পরবর্তী সময়ে কোন কোন সংগীত সংজ্ঞায় নৃত্য প্রসঙ্গটি বাদ পড়েছে যেমন *ভক্তিরত্নাকরে* সংগীত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে- "গীতবাদ্যে উভে এব সংগীতমিতি কেচন"[২] দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞাতেই সংগীত কি কি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত তা বলা হয়েছে। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয়নি। *ভক্তিরত্নাকরেরই* অন্য একটি শ্লোক এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক- "রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভ গীতমিত্যভিধিয়তে" অর্থাৎ অনুরঞ্জক বা প্রীতিদায়ক স্বররচনাই গীত নামে পরিচিত"।[৩] এই সংজ্ঞাটিতে সংগীতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে রঞ্জকত্ব গুণ থাকতে হবে এবং সংগীতক্রিয়া অবশ্যই প্রীতিদায়ক হতে হবে, অর্থাৎ ভালো লাগতে হবে।

উল্লেখ্য প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে গীতবাদ্যের আধার রাগ বিষয়টিও প্রায় একইভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। রঞ্জকত্বগুণ আছে বলেই এর এহেন নামকরণ। সংগীতের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, রসের উল্লেখ পাওয়া যায় বেশ কিছু সংজ্ঞায়। এই ধরনের কিছু সংজ্ঞা টীকা সহ উল্লেখ করছি-

"জাতয়ং রসসংশ্রয়া" (*নাট্যশাস্ত্র*, ভরত) - রসকে আশ্রয় করেই জাতিরাগ;
"যস্মাজ্জায়তে রসপ্রতীতিরারাভ্যতে ইতি জাতয়" (*বৃহদ্দেশী*, মতঙ্গমুনি, পঞ্চম শতাব্দি)- রসপ্রতীতি, রসের উপলব্ধিই জাতিরাগের মূল কথা।
নবম শতাব্দির বিশিষ্ট আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনও অনুরূপ ধারনা ব্যাক্ত করেছেন- "তথাদি গীতাদি শব্দেভ্যোহেপি রসাভিব্যাক্তিরস্তি (*ধ্বন্যালোক*)- সংগীতের স্বর থেকেও রসের অভিব্যক্তি ঘটে।
পরবর্তি সময়ে অভিনবগুপ্তের মন্তব্যেও দেখা যাচ্ছে একই ধারণার নিদর্শন- "রসপ্রতীত্যুদয়স্য পদবিরহিত স্বরালাপ গীতাদৌ।" অর্থাৎ পদবিরহিত স্বরালাপেও রসপ্রতীতি ঘটে।

প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সংগীতসংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দুটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এক হচ্ছে স্বরঞ্জকতা, যা নিতান্তই রূপনির্ভর দ্বিতীয় হচ্ছে রসপ্রতীতি।

রস প্রসঙ্গে আসা যাক- রস বিষয়টিকে প্রাচীন শাস্ত্রবিদ বিশেষ করে সংগীত শাস্ত্রবিদরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় কাব্য ও নাটক যতটা প্রাধান্য পেয়েছে ততটা প্রাধান্য পায়নি সংগীত। অলংকারশাস্ত্রে কাব্যপাঠজনিত বিশেষ আনন্দই 'রস' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। আনন্দের আস্বাদনই রস। "সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম" (*ধ্বন্যালোক*)। বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি- "তত্র বিভাবানুভাবব্যাভিচারী সংযোগাদ রসনিস্পত্তিঃ (*ধ্বন্যালোক*)। অর্থাৎ ভাব অনুভাব থেকে রসের উৎপত্তি এবং আনন্দ বা হৃদয় আহলাদ এর প্রতিক্রিয়া। ভাব থেকে রসের উৎপত্তি হলেও ভাব ও রসের অনুভূতি এক নয়। ভাব ব্যাক্তিগত অনুভূতি আর রস এর শৈল্পিক প্রকাশ, ব্যক্তিসংকীর্ণতামূক্ত, নৈর্ব্যাক্তিক এক লোকত্তর আনন্দ।

কিন্তু অনুভাব বা ভাব বাক্যকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়; তবে সংগীতে রসের হেতু কি? সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর *"ধন্যালোক ও লোচন"* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "পদশূন্য স্বরালাপ গীতাদিতে অর্থপ্রতীতি ব্যাতিরেকে রসপ্রতীতির উদয় হইয়া থাকে।" অর্থাৎ সংগীত স্বতই রসাত্মক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি অর্থপ্রতীতি ব্যাতিরেকে রসপ্রতীতির উদয় হয়ে থাকে তবে নবরসের বিভিন্নতা সংগীতে প্রকাশ করা সম্ভব কী না। অর্থহীন নান্দনিক স্বরসমন্বয়ই যেখানে রসসৃষ্টির মূল সেখানে রসবৈচিত্রের প্রকাশ কিভাবে হয়? শাস্ত্রীয় সংগীত গ্রন্থগুলিতে রাগবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রসের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ভিন্ন নামাঙ্কিত এইসব রসের স্বরলক্ষণ কী, কোন কোন স্বরসমন্বয়ে একটি বিশেষ রস প্রকাশ করে এর কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচিত "সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে সংগীত শাস্ত্রকারদের প্রতি একটি আহবানের কথা তুলে ধরছি- "কী কী সুর কীরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা করে তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী, তাহাই আবিস্কারে প্রবৃত্ত হউন।" রসকে আশ্রয় করে স্বররূপের ব্যাকরণ তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি বলেই রাগ ও রসের বিপরীত দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ রাগ এক রস একাধিক, অথবা একই রসের প্রকাশে বিপরীত স্বরবিন্যাস। যেমন 'সংগীত রত্নাকরে" দেখা যায় শুদ্ধকৌশিক রাগ বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে গেয়, গৌড়কৌশিকমধ্যম ভয়ানক ও বীর রসে, গৌড়পঞ্চম ভয়ানক বীভৎস ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে, গৌড়কৌশিক রাগ করুণ, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে গেয়। একই রাগে রসপ্রকাশের এই বৈপরিত্য থেকেই বোঝা যায় যে শাস্ত্রগত কোন স্বরসমন্বয়ই স্পষ্ট অর্থবোধক হয়ে উঠতে পারে না। "সংগীত সময়সার" গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন যে "গানে প্রযুক্ত রাগবাচক স্বরসমুদয় রস পরিপাক প্রক্রিয়ায় ভাষার সহায়কমাত্র, স্বরের দ্বারা রসব্যাঞ্জনা অস্পষ্ট ও অব্যাক্ত"। এখানে কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের গীতসূত্রসার গ্রন্থ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি তুলে ধরছি। তিনি সংগীত শাস্ত্রকারদের সম্বন্ধে বলেছেন- "তাহারা এক এক রাগ এক এক রসে গাওয়ার নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরসকল কি প্রকারে

বিন্যস্ত হইলে কি অর্থ হয়- কি রস হয়, অগ্রে তাহার মীমাংসা না করিয়া এমনিই রাগের রস নিরূপণ করাতে তাহাদের মতও পরস্পর ঐক্য হয় নাই।"

দেখা যাচ্ছে সংগীত বিশুদ্ধরূপে কোন নির্দিষ্ট রস সৃষ্টি করে না। প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী সংগীতে বিশেষ রসের উল্লেখ কাব্য ও নাট্যের প্রয়োজনে অথবা বাস্তব বর্ণনার সামগ্রিক ভাবাহত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জণার দ্যোতক রূপে নয়। সংগীতরস বিভিন্ন নামাঙ্কিত নবরসের স্থূল বিচারের অন্তর্ভূক্ত নয়, এর তাৎপর্য আরো গভীর, নামে ভিন্ন হলেও আস্বাদে অভিন্ন এবং আনন্দস্বরূপ। সংগীত এক আনন্দময়, অখন্ড চিত্তানুভূতি। করুণ নয়, বীর নয়, রৌদ্র নয় সর্ব্বপ্রকার রসের আদিভূত এক আনন্দময় সম্বিত। সুখ, দুঃখ, রোষ ইত্যাদি অভিব্যাক্তির প্রকাশ নয়, স্বরবিভূষিত রঞ্জকতা এবং এর আস্বাদই সংগীতরস। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধে 'রাগ' এর সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে বলেছেন "রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রং। এই শব্দটাকে যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভাল লাগা।" সংগীত শাস্ত্রকারগণ রাগবিচারে যে বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, যেমন বাদী, সমবাদী, ন্যাস, অপন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলিও রসবাদকে সমর্থন করে না বরং রঞ্জকতানির্ভর গঠনগত রূপকেই প্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজ কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৮১
২।	অমিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	৬০
৩।	প্রাগুক্ত		৬০
৪।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)	৪৭
৫।	অমিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	৬০
৬।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)	৯
৭।	অমিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা জানুয়ারী-১৯৯৫	৬২

রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনায় ভাববাদ ও রূপবাদ

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার শুরু এবং আত্মউপলব্ধ সংগীতচেতনার প্রকাশ প্রায় সমকালীন। সংগীতরচনারম্ভের অল্পকাল পরেই মাত্র বিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ *'সংগীত ও ভাব'* পাঠ করেন (উল্লেখ করা প্রয়োজন এটিই সভাস্থলে গঠিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ) ১৮৮১ সালের ১৯শে এপ্রিল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পরে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে কবি একদিকে তৎকালীন ওস্তাদদের গায়নপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন অন্যদিকে নবতর বাংলা সংগীতসৃষ্টির পথ নির্দেশ দেন। বক্তৃতা দান কালে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে আপন যুক্তির স্বপক্ষে উদাহরণ তুলে ধরেন। সে সময়কার গায়কদের তীব্র সমালোচনা করে কবি মন্তব্য করলেন- "আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেমন মৃত ভাষা আমাদের সংগীত শাস্ত্র তেমনি মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে।" সংগীতের ওস্তাদদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে তুলনা করে কবি বলেন যে, নব্য কবির লেখা কোন কবিতার সমালোচনায় "নস্য সেবক চালকলাজীবী আলংকারিক সমালোচকেরা" যেমন অলংকারের পুঁথি খুলে ষত্ব, ণত্ব, তদ্ধিত, প্রত্যয়, সমাস, সন্ধি যাচাই করেন, ভুলে যান এর ভাবরূপের কথা কাব্যময়তার কথা, তেমনি ওস্তাদরাও গান শুনে প্রথম বিচার করতে বসেন এর বৈয়াকরণিক শুদ্ধতা, অর্থাৎ বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি। সংগীত, কবিতা, শিল্পের উৎসস্থল হৃদয়গত ভাবোচ্ছাস, ব্যাকরণ এর সুষমাময় রূপনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।" 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে উল্লিখিত সংগীতে ভাববাদী ব্যাখ্যার কিছু অংশ তুলে ধরছি।

"রাগ রাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল ? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা

সংগীত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়-সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে 'আমার আহ্লাদ হইতেছে' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়। তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতার রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র।

কোন কোন রাগে কী কী সুর লাগে তা বিচার না করে রবীন্দ্রনাথ সংগীতবেত্তাদের আহবান করেন কোন কোন রাগ কী কী ভাব প্রকাশ করে এবং কেন করে তার অনুসন্ধান করার জন্য। আমাদের কথোপকথনে সুখ ও দুঃখ প্রকাশে সুর প্রয়োগের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেন- "আমরা দুঃখ ও সুখ কীরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি-হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা করিয়া ডিঙাইয়া যায়। সংগীতে তালকেও রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাশের একটি অঙ্গরূপে দেখেছেন। কেননা তালের দ্রুততা ও ধীরতায় ভাবপ্রকাশের পরিবর্তন ঘটে, কাজেই সংগীতে "সর্বত্রই তাল সমান রাখিতে হইবে তাহা নয়। ভাব প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভাল হয়।"

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে সংগীত সম্বন্ধে কবির সিদ্ধান্ত এই "সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান; যতখানি ভাব প্রকাশে সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত।"

"সংগীত ও ভাব" প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ Herbert Spencer এর The Origin and Function of Music প্রবন্ধটি পাঠ করেন। Spencer এর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ প্রবন্ধের অনুকরণে তিনি রচনা করেন সংগীত সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ "সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা" (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)।

Spencer এর বক্তব্যের অনুকরণে কবি বলেন যে, আমাদের মনোভাবের তীব্রতা, উত্তেজনা অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্রস্থিত মাংসপেশী বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং আমাদের কণ্ঠস্থিত স্বরে বিভিন্নতা আসে। অর্থাৎ "আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ" উত্তেজিত মনোভাব প্রকাশে আমাদের কণ্ঠে সুরের 'আমেজ আসে (সুখ, দুঃখ, খেদ, ক্রোধ ইত্যাদি যে কোন বেগবান মনোবৃত্তি)। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের বেগবান মনোবৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশই সংগীত। "তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।" "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায় স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি।"

আমাদের কথোপকথনের দুটি উপকরণ বিদ্যমান একটি কথা (শব্দ, বাক্য) আরেকটি এর প্রকাশের ধরণ। কথা ভাবের চিহ্ন (sign of ideas) আর প্রকাশের ধরণ অনুভবের (sign of feeling)। বিশেষ শব্দ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, আর সুর হচ্ছে এর সাথে সুখ, দুঃখ উত্তেজনার হার্দিক প্রয়োগ। "বুদ্ধি যাহা কিছু কথায় বলে হৃদয় ধরন দিয়া তাহারই টিকা করে" "বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবন সঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে, সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" কবির মতে এই "আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল" সংগীতের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা বিচার করতে গিয়ে কবি বললেন, "সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত সুখ দেয়। তৎসঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার পরিস্ফূটতা সাধন করিতে থাকে।" কিন্তু এই অব্যবহিত সুখই সংগীতের উদ্দেশ্য নয়, সংগীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা, কথার অর্থ ব্যাখ্যা করা।

মাঘ ১২৮৮ তে প্রকাশিত হয় সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ "সংগীত ও কবিতা।" এই প্রবন্ধে সংগীতকে কবিতার সাথে তুলনা করে কবি বললেন "সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে– কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীত ও তেমনি ভাবের ভাষা।"

গদ্য ও পদ্য ভেদে ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। আমাদের কথোপকথনের ভাষা যুক্তির ভাষা গদ্য, ভাবের ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়। "গোলাপ সুন্দর" একথাটি যুক্তির ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়, কেননা যুক্তি দিয়ে গোলাপের সৌন্দর্য বর্ণনা সম্ভব নয়। বড়জোর এর আকার আকৃতি মাপজোক বোঝানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই বলা যাক-

"আমি বিশ্বাস করিতেছি একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারি দিক মাপিয়া-জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল। আর আমি অনুভব করিতেছি যে, গোলাপ সুন্দর; হাজার যুক্তির দ্বারা তোমাকে অনুভব করাইতে পারি না যে, গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্যভাবের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা।"

আমাদের কথোপকথনে আমরা সাধারণত গদ্যভাষা (যুক্তি ভাষা) ব্যবহার করি। তবে অনুভূতি প্রকাশের আতিশয্যে মাঝে মাঝে কবিতার ভাষাও চলে আসে। তেমনি আমাদের কথোপকথনে একটা সুর লেগেই থাকে। কথা যতখানি ভাব প্রকাশ করে সুরও ততখানিই ভাব প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে।

"আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে- কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায়

মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দেই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দেই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে-সকল কথা যেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি কবিতায় আমরা সে -সকল কথা সেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি না, কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি-তেমনি কথোপকথনে আমরা সে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি সংগীতে সে-সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা-বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা-বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতিত আর-কিছু আবশ্যক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে। তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে।" (*সংগীত ও কবিতা*)।

শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে কবি সংগীতে শাস্ত্রোক্ত নাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। সংগীত সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ ওস্তাদের প্রতি কবির পরামর্শ -"যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুঝিয়া পূরবী না গাহিয়া যান-যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন—তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুর ও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। "

ক্রমে সংগীতসৃষ্টি পথে চলতে চলতে কবি তাঁর প্রথম বয়সের ভাবাবেগবাদ থেকে অনেক খানি সরে এলেন। *'সংগীত ও ভাব'* প্রবন্ধ পাঠের একত্রিশ বছর পরে কবি প্রথমোক্ত মতবাদটি খণ্ডন করে *'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধতে* কবি বললেন—

"যে মতটি তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেই খানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।"

এই প্রবন্ধটি কবির সংগীতচিন্তার বিবর্তনের পথে একটি বড় রকমের বাঁক হিসেবে ধরে নেয়া যায়। ভাববাদী সংগীতচিন্তার প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ যেন রূপবাদের দিকে ঝুঁকলেন। তবে কি গানে কবি কথার গুরুত্বকে অস্বীকার করলেন? কবি ইঙ্গিত দিলেন বিশুদ্ধ সংগীতে এই সূত্র যতটা প্রযোজ্য বাংলা গানে ততটা নয়। কেননা বাংলাদেশে সংগীতের সাধারণ বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, কথাকে আশ্রয় করেই এর উৎকর্ষ। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী থেকে শুরু করে নিধুবাবুর টপ্পা পর্যন্ত সবাই কথার অনুবর্তন স্বীকার করে নিয়েই সংগীত রচনা করেছেন।

এর পরে শিল্প সম্বন্ধে কবির গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'অন্তর বাহির' ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বিলাত যাবার সময় জাহাজে বসে লেখা। জাহাজে ঝড়ের দৃশ্য দেখে, মেঘগর্জনের বিভিন্ন শব্দ শুনতে শুনতে বহিঃদৃশ্যের সঙ্গে অন্তরের যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের যোগ পেলেন তাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

মহাসমুদ্রের এই তরঙ্গের কলধ্বনি, বাতাসের গর্জন শুনতে শুনতে কবির মনে এক বৈসাদৃশ্যের সুর বেজে উঠল। তা বাইরের শব্দের প্রতিধ্বনি নয়, তা গভীর বিলম্বিত-"যেন মৃদঙ্গ করতালের বলবান শব্দের মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া

বুকের ভিতর বাজিতে থাকে। তেমনি ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল" কবির মনের যন্ত্রে বেজে ওঠা এই গান বাইরের শব্দের অনুকরণ নয়। তা এই "বিপুল শব্দেরই অন্তরতর ধ্বনি," "তাহার বাহিরে শব্দ অন্তরে গান।"

বাইরের দৃশ্য-শব্দের এই যে আন্তরিক সাংগীতিক প্রতিক্রিয়া, এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য যুক্তি নেই, ব্যাখ্যা নেই। তা অনির্বচনীয় মিল। এই মিলের তত্ত্বেই শিল্পের সৃষ্টি, শিল্পের প্রকাশ। বাইরের দৃশ্য, স্পর্শ, শব্দের প্রতিরূপে অন্তরে জেগে ওঠে সৌন্দর্য। পৃথিবীর এই বাহ্যিক প্রকাশ বস্তুগত, এর "অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী।" "জগতে রূপ জিনিসটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র।" ভারতীয় সংগীত বিশ্বরস প্রকাশ করে। কিন্তু সকাল বেলার রাগ টৌড়িতে কি সকালবেলাকার বহিঃপ্রকতির সাথে কোন মিল পাওয়া যায়? সকাল বেলার শব্দ, নিঃশব্দতার অন্তরতর যে গান আমাদের গুণীরা শুনেছেন তারই প্রকাশ ভৈঁরো টৌড়ি। চোখে দেখার বিষয়কে, অনুভবের বিষয়কে তারা প্রকাশ করলেন সুরে, কানে শোনার বিষয়ে। কবি বলেছেন "পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী।" জাহাজে গান করছেন এমন কয়েকজন শিল্পীর উদ্ধৃতি দিয়ে কবি বললেন যে, তারা যেন সুরের মাধ্যমে হৃদয়ের উত্থান পতনকে জোর দিয়ে ঝোঁক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। কবি বলছেন "গানতো স্বভাবের নকল নহে," "অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই।" কেননা "বাহিরের দিকে যাহা আবেগ অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য।"

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) রামমোহন লাইব্রেরীতে স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে তদানীন্তন সংগীত সংঘের সভায় কবি পাঠ করেন সংগীত সম্বন্ধে তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ "সংগীতের মুক্তি"। প্রবন্ধটি পরে সবুজপত্রে (ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

কবি রাগ শব্দের মূলগত অর্থ করলেন মনের রং, চিত্তের উদ্দীপ্তি, (এই উদ্দীপ্তি ভালো লাগা বা ক্রোধ যে কোন অনুভূতি প্রসূত হতে পারে) হৃদয়ের আভা। এই আভারই সুরগত

প্রকাশ হচ্ছে রাগ। অনির্বচনীয় বিশ্বরসের মানবীয় সুরময় প্রকাশই রাগ- "ভোরবেলাকার আকাশে, হাওয়ায় এমন কিছু একটা আছে যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্বচনীয়।" এই অনির্বচনীয়তাই প্রকাশ করে ভারতীয় রাগসংগীত।

ওস্তাদকৃত স্বরসমষ্টিগত বৈয়াকরণিক পকড়ের বিপরীতে কবি যেন রাগমালার ভাবরূপের পকড়গুলি ব্যাখ্যা করলেন- "ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গসংগীতরসে স্নাত কবিচিত্ত। তবে তাঁর গানে কি কবি এই রাগ রূপায়ণকে প্রাধান্য দিয়েছেন? বাংলা গানের, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনের আদর্শ ব্যাখ্যা করে কবি দেখিয়েছেন যে বাংলা গান হিন্দুস্তানী গানের মতো জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে কাব্যের ভাবকে। তাঁর গানে কবি হিন্দুস্তানী ঠাটকে গ্রহণ করেছেন, সমগ্র রাগরূপায়ণ নয়। রাগের ছোট ছোট টুকরা স্বরসঙ্গতির আপাত নির্যাসটুকুই কবির সংগীতরচনার উপজীব্য। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে কবি বলেছেন "সংগীত সুরের রাগরাগিণী নয়, ভাবের রাগরাগিণী।"

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর (১১ই পৌষ ১৩৪১) কোলকাতা সিনেট হাউসে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্‌পিটিশন ও কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন বড়দিনের ছুটিতে কোলকাতা। তাঁর অনুরোধে কবি সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। মতবাদের দুটি দিক বক্তৃতায় উঠে আসে-

প্রথমত; "সংগীতকলা প্রাণধর্মী। সুতরাং জীবন যেমন রূপবৈচিত্র্যে বিকশিত হয়, সংগীতেরও তেমনি যুগোপযোগী পরিবর্তন ও রূপবৈচিত্র্য বাঞ্ছনীয়। হিন্দুস্তানী সংগীত সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। ক্ল্যাসিক মানে সর্বাঙ্গ সুন্দর, অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়।"[১]

দ্বিতীয়ত; "বাংলা গানের স্বকীয়তা শুধু সুরে নয়, শুধু কথায় নয়, কথা ও সুরের প্রকৃষ্ট মিলনের মধ্যে। সংগীতের জগতে গানে কথার সহযোগী হয়ে চলতে গিয়ে সুরের সম্পূর্ণ মর্যাদা হয়তো রক্ষিত হয় না, কিন্তু উভয়ের সংযোগে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় আনন্দ পাওয়া যায়, কথা বা সুরের পৃথক উন্নতি দ্বারা যা সম্ভব হত না।"[২]

পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে দীর্ঘ পত্রবিতর্ক চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথ ও ধুর্জটিপ্রসাদের মধ্যে। এই পত্রবিনিময়ে কবির সংগীতচিন্তার নানান দিক উঠে এসেছে।

ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ১৯৩৫ সালের ১৩ জুলাই এর একটি পত্রে কবি প্রথম বয়সের ভাবাবেগবাদের কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সের গানের তুলনা করেছেন এই ভাবে।

"উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা।" "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে'- এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপপ্রকাশ অহৈতুক।" "আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক, সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন।"

রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা, সংগীতচিন্তার আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ভাববাদকে ভিত্তি করে শুরু হয় তাঁর সংগীতচিন্তা। ক্রমপরিণতি পথে আমরা দেখি আবেগ বা ভাব শুধুমাত্র উপলক্ষ্য হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে রবীন্দ্রসংগীততত্ত্বে, প্রাধান্য পেয়েছে শিল্পরূপ। রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টিতে সংগীতের এই ভাববাদী ও রূপবাদী প্রকাশ কতটা প্রযুক্ত আলোচনা করা যাক।

সতেরো বছর বয়সে লেখা 'শুন গো নলিনী খোল গো আঁখি', 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে', 'বলি ও আমার গোলাপবালা', ইত্যাদি গানগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় কবির আবেগপ্রসূত হৃদয়ভাবকেই প্রকাশ করেছে গানগুলি। কিন্তু এক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ শুধুই উপলক্ষ্য মাত্র নয় কি? ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ উদ্বৃত্ত হয়েও প্রথম বয়সের এই গানগুলি রসিক শ্রোতার মনে নৈর্ব্যক্তিক অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। ভানুসিংহের পদাবলী প্রথম জীবনে রচিত হলেও এত ব্যক্তি আবেগের কোন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ 'শাঙন গগনে ঘোরঘনঘটা (১৬ বছর, ১৮৭৭ খ্রিঃ) গানটির আলোচনা করলে দেখা যায়, ব্যক্তি আবেগ নয় এতে কল্পনার রূপলীলাই প্রকাশ পাচ্ছে। দুর্যোগপূর্ণ বর্ষায় রাধার অভিসার যাত্রার চিত্রকল্পকে ব্যক্তিভাবের প্রকাশ বলা যায় না কোন ক্রমেই। গীতিনাট্যের সংলাপে সংগীতের এই মতবাদকে প্রয়োগ করা হলেও তাঁর পরবর্তী জীবনের সংগীতসৃষ্টিতে এই আদর্শ তেমন করে আসেনি।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বিপরীত ভাবের গানে একই সুর ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু গানের উদাহরণ দেয়া হল বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা/অশান্তি আজ হানল একী দহনজ্বালা, চলে ছলো ছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায়। দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়, বাকী আমি রাখব না/আমার এই রিক্ত ডালি। উদাহরণ আর না বাড়িয়ে আলোচনায় আসা যাক। দেখা যাচ্ছে একই সুরে কবি প্রকাশ করছেন জয়ের মালার আনন্দ আর অশান্তির দহনজ্বালা। ছলো ছলো নদীধারা আর শরতপ্রভাতের শুকতারা, ঐশ্বর্যের সুর আর রিক্ততার সুরও একইভাবে বেজে উঠল কবির গানে।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়ই এই আপাত স্ববিরোধী সুরপ্রয়োগের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে রাগ শব্দটির মৌলিক অর্থ করা হয়েছে রং। মনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

করলে এর বিপরীত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি ক্রোধ, অপরটি ভাল লাগা অনুরাগ, এই আপাতবিরোধী অনুভূতির একটি গভীর ঐক্য আছে, তা হচ্ছে 'চিত্তের উদ্দীপ্তি' উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়। এই চিত্তের উদ্দীপ্তিই শিল্পপ্রেরণায় মূল কথা। এই প্রসঙ্গে রমা রলাঁর সাথে আলোচনায় শিল্প প্রেরণার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায়। "Emotion only supplies the occation which makes it possible to bring forth the creative art." এই সুক্ষ্ম রহস্যের গুণেই বৈরাগ্য জীবনানন্দের গান এক হয়ে যায়, প্রেমের সুর চলে আসে পূজার গানে, নদীর চলা আর শুকতারার উন্মীলন একই সুর অবলম্বন করে।

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বের সাথে হ্যান্সলিকের সংগীততত্ত্বের মিল পাওয়া যায়। একান্ত রূপবাদী হয়েও হ্যান্সলিক মত প্রকাশ করেছেন যে, অনুভূতির অন্তর্নিহিত বিষয়টি উপস্থাপিত করতে না পারলেও তা অনুভূতির গতিপ্রকৃতি, চিত্তের উদ্দীপ্তি প্রকাশ করতে পারে। সংগীত "পারে শুধু তাদের (মানসিক ক্রিয়ার) গতি-প্রকৃতিকে রূপ দিতে। মানসিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক গতিকে বেগ অনুসারে উপস্থাপিত করতে পারে।"[৩]

'রূপ' এর প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপ বলতে রবীন্দ্রনাথ সংগীতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনার যে আলোচনা করা হল তাতে এটুক স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক রূপ এডুয়ার্ড হ্যান্সলিকের ধ্বনিসৌন্দর্য নির্ভর বিমূর্তরূপবাদী বা রূপকৈবল্যবাদী রূপ নয়। "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করা চেষ্টা করেছি গানে..... পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয় রূপ দেবার জন্য" কিন্তু পরিণত বয়সের রূপ প্রকাশ করার জন্য যে গান তার অবলম্বনও তো অর্থবোধক কাব্য। অর্থবোধক শব্দসম্ভারে সুরের অহৈতুক আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন রবীন্দ্রগবেষক এই রূপকে চিত্রকল্প (imagery) বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রথম বয়সের ভানুসিংহের পদাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কথায় সুরে চিত্রকল্প সৃষ্টির সার্থক প্রকাশ প্রথম বয়সেই কবি করেছেন। প্রথম বয়স এবং শেষ বয়সের যে কোন দুটি গানের তুলনা করছি। প্রথম বয়সের গান হিসেবে "তুই রে বসন্ত সমীরণ' (বিশ বছর বয়সে রচিত) এবং পরিণত বয়সে লেখা "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে" (সাতাত্তর বছর বয়সে লিখিত)।

গান-১

কাফি। ঝাঁপতাল

তুই রে বসন্ত সমীরণ।
তোর নহে সুখের জীবন।।
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাকনে করিস বিচরণ।
নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন।
তোর নহে সুখের জীবন।।

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লাতকুঞ্জে আয়।
নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখির মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ।
তাই বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়।।

গান-২

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি-
লহো লহো করুণ করে।।
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে।।
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে।।

I গা গপা পা । পা পা -ক্ষা । ক্ষাধপা -ক্ষা -পা । ^পক্ষা গা -া I
কু ড়ি০ য়ে নি য়ে ০ ছি০০ ০ ০ তো মা র

I গা ক্ষা পা । পক্ষা ^গক্ষা -গা I গা -া -া । গা গা -ক্ষা I
চ র ণে দি০ য়ে ০ ছি ০ ০ ল হো ০

I ক্ষনা না -ধা । ধা পা পা I ক্ষা গা -া । -া গা -ক্ষা)} I | ||
ল০ হো ০ ক রু ণ ক রে ০ ০ এ ই

অনবদ্য শব্দচয়নে এবং সুরের যথার্থতায় দুটি গানই অপূর্ব চিত্ররূপ তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। তফাৎ শুধু পরিপক্কতার। প্রথম গানটির তুলনায় কথা ও সুরে দ্বিতীয় গানটি অনেক হৃদয়গ্রাহী।

দেখা যাচ্ছে প্রথম বয়সের সাথে পরিণত বয়সের তফাৎ শুধু পরিপক্কতার। লক্ষণীয় উক্তিটিতে কবি তাঁর পরিণত বয়সের (ছত্রিশ বছর) গানের উদাহরণ দেয়ার পরই ইঙ্গিত করেছেন বিশুদ্ধ সংগীতের দিকে, যাতে "কান্নাহাসির সম্পর্ক" বিহীন "গীতরূপের গম্ভীরতা" অনুভব করা সম্ভব। সংগীতে 'বৈরাগ্যের আনন্দ' ব্যক্তিগত "রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তির আনন্দ" অর্থাৎ ভাবহীন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ কোনভাবেই সম্ভব নয় কাব্যসংগীতে, কেননা কাব্যের সহযোগেই তার প্রকাশ। সেই মুক্তির রূপের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন 'ভৈঁরোতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়', তাঁর নিজের গানে নয়। বাংলা গান রূপের উচ্চশিখরে পৌছবার চেষ্টা করুক এই প্রত্যাশা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তথ্যসূত্র

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	পৃষ্ঠা
১।	সিতাংশু রায়	সংগীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ চয়নিকা, কোলকাতা (১৯৯৭)	১৮
২।	প্রাগুক্ত		১৮
৩।	সাধন কুমার ভট্টাচার্য	সংগীতে সুন্দর দে'জ পাবলিশার্স, কোলকাতা (২০০২)	৪০

* অধ্যায়টিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁর সংগীতচিন্তার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। *সংগীত ও ভাব, সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগীতা, সংগীত ও কবিতা, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, অন্তর বাহির, সংগীতের মুক্তি, আলাপ আলোচনা, সুর ও সঙ্গতি, Tagore with Rolland* এইসব প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত। এই প্রবন্ধগুলি *সংগীতচিন্তা* (রবীন্দ্রনাথের সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন) বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কোলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯১ গ্রন্থে সংকলিত।

গ্রন্থপঞ্জি

ক্রঃ নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
১।	সিতাংশু রায়	সৌন্দর্যদর্শন, প্রাথমিক পরিচয় সুবর্ণরেখা, কোলকাতা প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৯৯৯
২।	সুচেতা চৌধুরী	সংগীত ও নন্দনতত্ত্ব আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা প্রথম সংস্করণ, জুলাই-১৯৮৮
৩।	সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত	রবীন্দ্র সংগীতায়ন (১) প্যাপিরাস, কোলকাতা-৭০০০০৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী-১৯৮৯
৪।	সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত	রবীন্দ্র সংগীতায়ন (২) প্যাপিরাস, কোলকাতা-৭০০০০৪ প্রথম সংস্করণ, মে-১৯৯০
৫।	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, প্রথম খন্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কোলকাতা
৬।	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজ কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চতুর্থ সংস্করণ- ১৯৯১
৭।	সন্‌জীদা খাতুন	রবীন্দ্রসংগীতের ভাব সম্পদ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০। প্রথম অবসর প্রকাশ, জানুয়ারী-১৯৯৯
৮।	সিতাংশু রায়	সংগীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ চয়নিকা, কলকাতা-৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭
৯।	অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগীতের সৌন্দর্য চিন্তা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩ প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-১৯৯৫
১০।	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র জীবন কথা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা-৯ প্রথম আনন্দ সংস্করণ মুদ্রণ, ১৪০৭ আষাঢ়-১৪০৭
১১।	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রজীবনী-১ম খন্ড বিশ্বভারতী কোলকাতা
১২।	সুধীর চক্রবর্তী	গানে গানে গাওয়া অবভাস, কলকাতা-৮৪ প্রথম সংস্করণ- ২০০৩

১৩।	সুধীর চক্রবর্তী	গানের লীলার সেই কিনারে অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬ প্রথম সংস্করণ- ১৩৯২
১৪।	ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী	রবীন্দ্রসংগীত; লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। জেনারেল বুকস দ্বিতীয় সংস্করন- ২০০০
১৫।	সাইফুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ- ২০০৩
১৬।	শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ-১৩৯৪
১৭।	শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা আনন্দ পাবলিশার্স তৃতীয় সংস্করণ (পঞ্চম মুদ্রণ), এপ্রিল-১৯৯৭
১৮।	সাধন কুমার ভট্টাচার্য	অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৮৫
১৯।	সাধন কুমার ভট্টাচার্য (অনুবাদ)	সংগীতে সুন্দর মূল গ্রন্থঃ The Beautiful in Music, Edward Hanslick. দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা। প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল- ২০০২
২০।	ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী	গানের ঝরনাতলায় অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৭
২১।	করুণাময় গোস্বামী	রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩
২২।	করুণাময় গোস্বামী	সংগীত কোষ বাংলা একাডেমী।
২৩।	করুণাময় গোস্বামী	বাংলা গানের বিবর্তন বাংলা একাডেমী। জুন- ১৯৯৩
২৪।	সুরেন মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র সংগীত কোষ সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা ২২শে শ্রাবণ- ১৪০৮

২৫। ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনন্দন তত্ত্ব
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট-১৯৯৯

২৬। ডঃ প্রণয় কুমার কুণ্ডু — রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা।

২৭। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় — সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত
প্যাপিরাস, কলকাতা।
প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯২

২৮। সুধীর চন্দ — রবীন্দ্র সংগীত; রাগ-সুর নির্দেশিকা
প্যাপিরাস, কলকাতা
প্যাপিরাস সংস্করণ-২০০২

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সংগীত চিন্তা
বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ
কোলকাতা (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ছেলেবেলা
রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খন্ড)
বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ-১৪০২ ১১০

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — জীবনস্মৃতি
রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খন্ড)
বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ-১৪০২

৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গীতবিতান
বিশ্বভারতী, কলিকাতা

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরবিতান-৮,২০,৫৯
বিশ্বভারতী, কলিকাতা

৩৪। ERIC BLOM — A MUSICAL POSTBAG J.M. DENT & SONS LTD., LONDON.

৩৫। — রবীন্দ্রসংগীত ভাবনা (প্রবন্ধ সংকলন)
রবিরঞ্জনী, কোলকাতা
১২৫তম জন্মবার্ষিকী, ১৯৮৬

৩৬। — পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রসংখ্যা-১৪০২)
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩৭। — পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রসংখ্যা-১৪০৩)
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩৮। — The Heritage of Music (Second Serics)
Oxford University Press. (1934)